আপনার অভিমত

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিপরীতে পাগল সম্প্রদায়ের জেহাদ

দেশভাগের পর পাগলনাথের ভক্তেরা ছড়িয়ে পড়ে। রানাঘাট থেকে দশ কিলোমিটার দূরে শ্রীধরপুর গ্রামে এলে সহজেই পাগল সম্প্রদায়ের দেখা মেলে। লিখছেন

পঙ্কজ বিশ্বাস

নদিয়ার ধর্মীয় সংস্কৃতি বাঙালি সংস্কৃতিকে অনেক কাল ধরে পুষ্ট করে এসেছে। এখানে বিভিন্ন সময় অনেকগুলি লোকধর্মের উদ্ভব ঘটেছে। 'কর্তাভজা' সম্প্রদায়, 'খুশি বিশ্বাসী' সম্প্রদায়, 'বলরামী' গোষ্ঠী, 'সাহেবধনী' বা 'দীনদয়ালের ঘর' ও 'লালনশাহী' মত। এই সব লোকধর্ম নিয়ে অনেক দিন ধরেই চর্চা হয়ে আসছে। কিন্তু কোথাও উল্লেখিত হয়নি আরও একটি বিশেষ লোকধর্মের কথা— 'পাগল সম্প্রদায়'। এই ধর্মীয় সম্প্রদায় নিয়ে চর্চা না হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হয়তো এর উদ্ভব বাংলাদেশের 'ঢাকা' এবং বয়সে অপেক্ষাকৃত নতুন। স্বাধীনতা-পরবর্তী কালে নদিয়ার যে যে স্থানে এই সম্প্রদায়ের মানুষ বসতি-স্থাপন করেছে, সেখানে এদের সংখ্যা বেশি নয়। পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া ছাড়াও এরা ছড়িয়ে আছে কোচবিহারের ফুলবেড়ি, জলপাইগুড়ির ব্রহ্মপুরের মতো গ্রামে। এমনকি, প্রতিবেশী রাজ্য অসমেও। রানাঘাট থেকে দশ কিলোমিটার দূরে শ্রীধরপুর গ্রামে এলে সহজেই এই সম্প্রদায়ের বিশেষত্বকে চিনে নেওয়া যায়।

গ্রামের পশ্চিম দিকে যেখানে এদের বসবাস, তার নাম 'পাগল পাড়া'। নদিয়ার অন্য লোকধর্মের মতোই এই ধর্মও গড়ে উঠেছিল বড় ধর্মের বিরুদ্ধতা করতে নয়, বরং নিজের মতো করে বাঁচার মন্ত্রই এদের গৌণধর্মে দীক্ষিত করেছে। শাস্ত্র, পুরোহিত তন্ত্র, মূর্তিপূজার মতো ব্যাপার এদের কখনও আকর্ষণ করেনি। সেদিক থেকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিপরীতে এই সম্প্রদায় এক প্রতিবাদ।

যে গ্রামীণ সাধকের জীবনকে কেন্দ্র করে এরা অনুপ্রাণিত, তিনি 'পাগলনাথ'। সম্প্রদায়টির বিশ্বাস, "মানুষ, মানুষ, ত্রিভেদ মানুষ, / পুরুষ মানুষ হয়। / তারে দরশন, করিলে কোটি / তীর্থের ফল হয়/ সেই শুদ্ধ মানুষ, চিনাইল শ্রীধামে/ অবতীর্ণ হইলেন পাগলনাথ নামে"।

কে এই পাগলনাথ? ভক্তদের কাছে 'আদি অন্তহীন শুদ্ধ মানুষ'। তাঁকে জানার উপায় রাম নারায়ণের লেখা 'নিত্যামৃত প্রেমচন্দ্রিকা', জলধর কর্মকার লেখা 'শ্রী শ্রী পাগল চরিতামৃত'। বোঝা যায়, চৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রভাব আছে এই সম্প্রদায়ের উপর।

লোকশ্রুতি অনুযায়ী, বৃহত্তর ঢাকার গাজীপুর জেলার অন্তর্গত কালিয়াকৈর থানার নিশিন্দাহাটি গ্রামে আনুমানিক ১২২০ বঙ্গাব্দে পাগলনাথ নমঃশূদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃদত্ত নাম 'কেশব'। শৈশবে তিনি দামাল প্রকৃতির ছিলেন। নেতৃত্ব দেওয়ার সহজাত ক্ষমতা ছিল তাঁর। বিদ্যার প্রতি তীব্র অনুরাগ ছিল। ছিলেন অভিজ্ঞ কৃষকও।

লৌকিক গল্পমতে, এক অলৌকিক ঘটনায় তাঁর এই গতানুগতিক জীবনে ছেদ পড়ে। 'ফলরের ছিট' নামে এক দুর্গম বনে তিনি একদিন সঙ্গীদের নিয়ে নদী পেরিয়ে কাঠ কাটতে যান। ঘটনাক্রমে সেখানে সঙ্গী গোবিন্দ দেখতে পান— "অপূর্ব পুরুষ আছে সুবর্ণ পালঙ্কে। / বিদ্যুৎ লহরী যেন কাদম্বিনী অঙ্কে/ দুধ সবরী কলা করিছে সেবন। / চতুর্দিকে আছে কত দেব-দেবীগণ"। এই কথা শুনে পাগলনাথও এই দৃশ্য দেখতে যান। তখন সেই 'অপূর্ব পুরুষ'-এর সঙ্গে দেব-দেবীগণ মিশে গিয়ে একটা প্রবল আলোর পিণ্ডে পরিণত হয়। তা গিয়ে মেশে পাগলনাথের 'কপাল'-এ।

এই ঘটনার পরেই নাকি পাগলনাথের জীবনে পরিবর্তন দেখা দেয়। পরিবর্তন দেখা যায় তাঁর খাদ্যাভ্যাসে। তিনি দুধ-কলা ছাড়া আর কিছু খান না। বিধবা মাকে শাঁখা-সিঁদুর পরার কথা বলেন। নিজের পরিবার ও সমাজের মানুষ তাঁর এই ধরনের পরিবর্তন ভাল মনে গ্রহণ করেনি। তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন জিন বা পরিতে পেয়েছে মানষটিকে। তাই এমন অদ্ভুত ব্যবহার। ফলে, সমাজের চোখে একঘরে হয়ে তিনি পরিণত হন 'পাগল'-এ।

তাঁর চরিত্রমাহাত্ম্য ও কার্যকলাপ দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তাঁর ভক্ত সংখ্যাও দিন দিন বাড়তে থাকে। তবে ভক্তদের অধিকাংশই ছিলেন নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষ। এই পাগলনাথকে নিয়েই ভক্তদের মধ্যে অনেক ধরনের মিথ গড়ে উঠেছে। মানুষও ভক্তি ভরে চাল-ডাল, টাকা-পয়সা দান করতে পারেন। পাগলনাথ এই সম্পদ বেঁচে অতিথিদের জন্য একটি পাকা বাড়িও নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু নিজে এক ছইয়ের মধ্যে থাকতেন।

দেশভাগের পর পাগলনাথের ভক্তেরা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এই শ্রীধরপুরেই এদের বর্তমানে সত্তর-আশি ঘরের মতো বাস। সাধারণ গৃহীদের মতোই এদের বেশভূষা। কৃষি এদের প্রধান জীবিকা। নিজস্ব ধর্মস্থান আছে। বৎসরান্তে এখানে সকলে মিলিত হন। ও পার বাংলা থেকেও ভক্তেরা এসেও সভায় যোগ দেন। ধর্মাচারের বিচিত্র নির্দেশিকা জারি হয়েছে এই ধর্মে— নিরামিষ ভোজন কর্মটা বাধ্যতামূলক। মূর্তি পূজার স্থান নেই। পরম পিতা পাগলনাথই একমাত্র আরাধ্য। পাগলের মন্দিরে তাঁর ব্যবহৃত নিম কাঠের পাদুকা থাকে। সেই পাদুকাই এদের কাছে পূজ্য। মেলায় জলচৌকির উপর আসন পেতে দুধ-সবরী কলা দিতে হয়। সকলে মিলে 'জয় পাগল' ধ্বনি দেন— "ব্রত একাদশী আর শ্রাদ্ধ আদি যত। / সকলই নিষেধ তাহা এই ধর্ম মত।।"

চুল, দাড়ি কাটা নিষেধ, এতে নাকি শরীরে সাধুভাব আসে। এদের বিবাহ প্রথায় 'গোঁসাই'-এর উপস্থিতিতে পাত্র-পাত্রীর সম্মতি বাঞ্ছনীয়। বিধবা বিবাহ এই ধর্মে আছে।

প্রতি বছর ২৬ বৈশাখ পাগলনাথের মন্দির প্রাঙ্গণে মেলা বসে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এই মেলায় সকলেই অংশগ্রহণ করেন। পাগলনাথ, পাগলধর্ম নিয়ে গানের চর্চা আজও এরা নিষ্ঠাভরে চর্চা করে চলেছে। সেই দিক থেকে অন্যান্য লোকধর্মের মতোই গান দিয়েই এরা হৃদয়ের দ্বার খুলতে চান— "পাগল নামের ধ্বনি শুনে শমন পলাইয়া যায়। / ত্রিতাপ জ্বালা ঘুচে যাবে পাগল নাম যার মুখে রয়।"

লেখক চাপড়া গভর্নমেন্ট কলেজের শিক্ষক

সমাজ স্বাস্থ্য সাহিত্য সংস্কৃতি

‘বিদ্রোহী’ কবিতা ও দুই কবির বিচ্ছেদের ইতিহাস

পঙ্কজ বিশ্বাস

[illegible]

শৈবতীর্থ চন্দ্রগিরি

তপনকান্তি নাথ

[illegible]

ACT 1950 WHO DESTROYS REMOVES INJURES ALTERS DEFACES IMPERILS MISUSES THIS MONUMENT SHALL BE LIABLE FOR PUNISHMENT

[illegible]

THIS SITE HAS BEEN DECLARED TO BE UNDER THE PROTECTION DEALING OF ARCHAEOLOGY ASSAM UNDER THE ANCIENT MONUMENT AND RECORDS

[illegible]

[illegible]

গতি

দৈনিক

নব পর্যায়ে তৃতীয় বর্ষ ● সংখ্যা ১১৮ ● শিলচর

২০ আশ্বিন ● ১৪২৭ বঙ্গাব্দ ● ৭ অক্টোবর ● ২০২০ খ্রিস্টাব্দ ● বুধবার

সম্পাদকীয়

হাথরসে পাশা বদল !

বর্তমানে সবচেয়ে চর্চিত বিষয় হাথরস-কাণ্ড। প্রকৃত ঘটনাটি কী তা অনেকেই বুঝতে পারছেন না। বুঝতে পারছেন না এই জন্য যে, এই ঘটনাকে যেভাবে রঙিন করে প্রচার করা হয়েছে, তার সততা কতটুকু, এই নিয়েই এখন সন্দেহ দেখা দিয়েছে। পুরো বিষয়টি যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তা ধীরে ধীরে প্রকাশ হতে শুরু করেছে। হাথরসে তরুণীর মৃত্যুকে ঘিরে প্রচার মাধ্যমের একাংশ এতটাই মুখর হয়েছিল যে, তরুণীর করুণ মৃত্যুর সব দায় পড়ে যোগী সরকারের উপর। ঘটনাক্রমের বিস্তৃত বিবরণ আমরা কদিন থেকেই জেনে আসছি। বলা হয়েছে 'দলিত' তরুণীকে উচ্চবর্ণের কেউ অপহরণ-ধর্ষণ-হত্যা করে। এই 'দলিত' তথা 'উচ্চবর্ণ' শব্দ দুটি অত্যন্ত সংবেদনশীল আমাদের দেশের রাজনীতিতে। সমাজকে ভাগাভাগি করে ভোটের ফায়দা তোলার ব্যাপারে বহু রাজনৈতিক দলের নেতারা সিদ্ধহস্ত। ব্রিটিশের 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতি অনুসরণ করে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ভারতের রাজনেতারা নতুন কাপড় পরিয়ে বিভেদের নীতিকে কার্যকর করার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন, এর ভুরিভুরি উদাহরণ রয়েছে যা প্রত্যেক সজাগ ভারতবাসীর জানা আছে। হাথরস ঘটনাও সেই নীতি মেনেই রাজনৈতিক রঙ নিতে শুরু করে।

উত্তরপ্রদেশ ভারতীয় রাজনীতির প্রধান আখড়া। এই আখড়া দখলের লড়াই নতুন নয়। উত্তরপ্রদেশের ক্ষমতা যে রাজনৈতিক দলের হাতে থাকে, তার প্রভাব সর্বভারতীয় রাজনীতিতে গভীর প্রভাব ফেলে—এ আমরা দেখে আসছি।

যোগী সরকার গঠনের পর রাজ্যের অরাজকতা কতটা বন্ধ হয়েছে, তাও সকলেই প্রত্যক্ষ করেছেন। স্বভাবতই বিরোধী পক্ষ এতে আনন্দিত হবে না, হতে পারে না। কারণ দেশ তথা রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের চেয়ে দলীয় উন্নতির লক্ষ্যেই চলার পরম্পরা হয়ে গেছে আমাদের। অযথা উত্তরপ্রদেশের কিছু নির্বাচিত স্পর্শকাতর বিষয়কে উস্কে দিয়ে রাজ্যে অস্থির পরিস্থিতি গড়ে তোলার কাজটি চলতে থাকে। হাথরসের ঘটনায় তাই 'দলিত' বনাম 'উচ্চবর্ণ' শব্দ দুটি নিয়ে পরম্পরাগত রাজনৈতিক চাপান-উতোর শুরু হয়। বর্তমান 'দলিত-ঠাকুর' ঘটনার সূত্রপাত এটাই।

উল্লেখ্য, যারা ষড়যন্ত্রকারী, তারা সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকজন, প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তি, রাজনেতার মদতপুষ্ট। সেই সুবাদে ষড়যন্ত্রকারীদের হাত যে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সরকার পক্ষ, বিরোধী পক্ষ— দুই-ই এ বিষয়ে অবগত। হাথরস-কাণ্ডের পর প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের গতিবিধির খোঁজ অবশ্যই ছিল যোগী সরকারের। গোপনীয় তথ্য সামনে আসে যোগী আদিত্যনাথের কাছে। সেই তথ্য মতে মুক্তার আনসারি-অতিক আনসারি-মাজন খানের মতো মিডিয়ার এক বিশেষ লোকজনদের একশ কোটি টাকা ফান্ডিং করে যাতে উত্তরপ্রদেশে জাতিদাঙ্গা ঘটানোয় সাহায্য করে। ছক ছিল মৃত তরুণীর পরিবারকে বের করে জাতিদাঙ্গার রূপ দেওয়ার। তা অনুমান করেই পুলিশ প্রশাসন উল্টো চাল চালায় এবং এই ষড়যন্ত্রকে রুখে দেয়। যোগী সরকারের অনুমানের সত্য-মিথ্যা ক্রমশ সামনে আসবে।

হাথরসে কী ঘটতে গিয়েছিল আর বাস্তবে কী ঘটেছিল সেই বিষয়ে সূত্রমতে যা সামনে আসছে, তা হল, এক দলিত পরিবারের তরুণীর সঙ্গে এক যুবকের প্রেমের সম্পর্ক ছিল আর তরুণীর পরিবার এতে অসম্মত ছিল। পরিবারের পক্ষ থেকেই মেয়েটিকে হত্যা করা হয় যা 'অনার কিলিং' বলা যেতে পারে। উল্লেখ্য, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের রিপোর্টে ধর্ষণের কোনও উল্লেখ নেই। পরিবারের লোক নার্কো টেস্টে রাজি নয় কেন— এই প্রশ্নও সামনে এসেছে। এখন যখন যোগী আদিত্যনাথ সিবিআই তদন্ত ও নার্কো টেস্টের কথা জানিয়ে দিয়েছেন, তখন এটা বুঝতে পারা যাচ্ছে যে ষড়যন্ত্রকারীদের পাশা পাল্টে যাচ্ছে। জানা গেছে, এলাহাবাদ হাইকোর্টে বিরোধীপক্ষের জনৈক নেতা আবেদন জানিয়েছেন যাতে সিবিআই তদন্ত ও নার্কো টেস্ট না করানো হয়। কেন? তবে কি নিজের পাতানো ফাঁদে নিজেই পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছে বিরোধীপক্ষ? সময় এর উত্তর দেবে।

চরিত্র মাহাত্ম্যেই বিদ্যাসাগর লেজেন্ডারি ফিগার হয়ে উঠেছিলেন

[illegible]

[illegible]

করোনা মহামারি ও মানবসভ্যতার আগামী পথচলা

[illegible]

[illegible]

গতি

দৈনিক

২৬ আশ্বিন • ১৪২৭ বঙ্গাব্দ • ১৩ অক্টোবর • ২০২০ খ্রিস্টাব্দ • মঙ্গলবার

সম্পাদকীয়

মেঘালয়ে বাঙালি নির্যাতন

আসামের অবিভক্ত আসাম প্রদেশে, বিশেষ করে পার্বত্য এলাকার এলাকাগুলিতে অনুন্নত মানুষের শিক্ষা, সংস্কৃতি তথা ব্যবসায়িক উন্নতিতে বাঙালির অবদান উল্লেখযোগ্য। যাঁরা এ বিষয়ে সন্ধান করেছেন, তাঁদের জানা আছে বর্তমান মেঘালয়, মিজোরাম, ত্রিপুরা, অরুণাচল, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল প্রদেশ অঞ্চলে সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশ সাধনে কীভাবে সক্রিয় সহযোগিতা এবং উদ্যম নিয়ে শিক্ষিত বাঙালিরা কাজ করে গেছেন। পার্বত্য এলাকার লোকজন যে সহজ-সরল জীবন যাপনে বিশ্বাসী, তাতে সন্দেহ নেই। বিশেষ করে উত্তরপূর্বাঞ্চলের মেঘালয়ের জনজাতিরা মূলত হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী। তারা সনাতন ধর্মপদ্ধতি মেনে জীবনযাপন করত। ছাপানো আলোক কম থাকায় তাদের সার্বিক বিকাশের পথ ছিল প্রায় রুদ্ধ। আসামের রাজধানী তখন শিলং। সেই সুবাদে অসমিয়া-বাঙালি কর্মী দল বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে কার্যরত ছিলেন। স্থানীয় স্থায়ী বাসিন্দারা তো ছিলেনই। তাঁরা শহরের কিছু এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থেকে খাসি সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলেমিশে একসঙ্গে জীবনযাপন করেন বহু বছর। ক্রমে খাসিদের মন-চিন্তনে উল্লেখযোগ্যভাবে বাঙালি শিল্প-সংস্কৃতি ও শিক্ষার প্রভাব বিস্তার লাভ করে। খাসিরা সহজ মনেই এই উচ্চ সংস্কৃতিকে আপন করে নিতে চেয়েছিলেন এবং পেরেছিলেনও।

পরবর্তীতে পাহাড়ি সাধারণ মানুষের মনে বিষ ছড়ানোর কাজ শুরু হয়। তাদের মনে এই ভয় জাগানো হয়, বাঙালিরা ক্রমে তাদের সমাজের স্বাভাবিক ছন্দকে নষ্ট করে ফেলতে পারে। এই বিষ কথা ছড়িয়েছিল, তা সুশীল সমাজের অজানা নয়। পরবর্তী সময়ে 'আসাম' ভেঙে টুকরো

টুকরো হয়ে যাওয়ার কারণ তাই। এ সব পর্যায় ক্ষেত্রে মানুষ মিত্র মিত্র অঞ্চলে প্রভুত্ব বজায় রাখতে সমতলের মানুষকে ঘৃণার চোখে দেখতে শুরু করে। তবে তাদের উন্নতির জন্য যে সমতলের কিছু মানুষের সহায়তা না হলেই নয়— তা উপলব্ধি করেন একদল। সে কারণেই বাঙালিদের এবং অন্য ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ের মানুষের উপস্থিতির গুরুত্ব টের পেতেন একদল উন্নয়নমনস্ক পাহাড়ি সম্প্রদায়ের লোক। মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম ইত্যাদি অঞ্চলে আমরা বাঙালিদের উপস্থিতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে থাকা দেখেছি। সত্যি কথা বলতে গেলে এতে প্রকৃতার্থে লাভবান হয়েছে সে সব পাহাড়ি অঞ্চলবাসীই। বর্তমান সময়ে এ সব অঞ্চলে যে শিক্ষার উন্নতির চিত্র নজরে আসে, তার পেছনে বাঙালির অবদান অনেক। তবুও মাঝে মাঝে বাঙালি বিদ্বেষ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে সেখানকার এক শ্রেণির মানুষের মনে। কঠিন কাজ বাঙালিদের উপর অত্যাচার করার প্রবণতা বহুকাল থেকেই চলছে। মিজোরাম অনেকটা শান্ত হলেও মেঘালয়ে এই ধারাটি চলে আসছে উল্লেখযোগ্যভাবে।

কিছুদিন ধরে মেঘালয়ের ইছামতি ও ভোলাগঞ্জ এলাকায় বাঙালি নির্যাতনের যে চিত্র সামনে আসছে, তা উদ্বেগজনক। খাসি সম্প্রদায়ের এক এনজিও-র অমানবিক নির্যাতনের শিকার ওইসব এলাকার বাঙালি বসবাসকারীরা। সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার 'আমরা বাঙালি' সংস্থা এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। মেঘালয় সরকার এ নিয়ে কোনও উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা না নেওয়ায় আন্দোলনের পথে যেতে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা। আমরা চাইব এই পরিস্থিতির শান্তিপূর্ণ সমাধানের প্রতি যত্নবান হোক মেঘালয় সরকার।

নিবেদিতাকে উপলব্ধির দায় আমাদের

[illegible]

[illegible]

(সূত্রঃ নিবেদিতা এক পরিক্রমণ — [illegible]; নিবেদিতা — লিজেল রেমঁ (অনুবাদ নারায়ণী দেবী); নিবেদিতা লোকমাতা (১ম খণ্ড ২য় খণ্ড)— শংকরীপ্রসাদ বসু; 'ভগিনী নিবেদিতা'— প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা; 'ভগিনী নিবেদিতা'— [illegible])

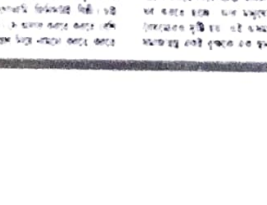

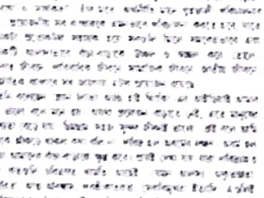

অর্থনীতি ও স্বনির্ভর ভারত প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

[illegible]

বাংলা শব্দের নতুন ট্রেন্ড

● পঙ্কজ বিশ্বাস ●

সকাল সকাল হ্যাপিই আছেন। শুভ বাপের বাড়ি যাবে বলে পেয়ে আছে। তাও সাত সাতটা দিন! আমারও উৎফিটনেস চূড়ান্ত। সব ভনভন হয়ে যাচ্ছে। আমার স্বভাবে দেখে ভাই জানায়, 'এতো লোড নেওয়ার কি আছে। চিল ব্রো, চিল। দু'টো সি.এল. নিয়ে চল তো এই ফাঁকে ল্যান্ড মেরে আসি। ক্যাম্প ওয়েদার আছে। ওসব ফিজিক্স নেওয়ার জন্য দিন তো ফুরিয়ে যাচ্ছে না।' অফিস আমরা আমরা করে একটা ডেকে যাই। ফিজক্ষেত্রে রোদ্দুর ফুটিয়ে তুলি। আমার হেডলাইন শুনে বউয়ের মিমাস পুরো সারেন্ডার। আর, আমার মিনতিও পুরো— 'টুম্পা টুম্পা'।

বলকারেন না। ভাষা নিয়ে পেঁয়াজি করছি না। আমাদের ধুলো-মলিন জীবনের ডিকশনারিতে এইসব কুচিকুচি শব্দ ঢুকেছে। কেননা ভাষার ধর্মই হচ্ছে নিজেকে আপডেটেড রাখা। নতুন নতুন রিয়ালিটির সঙ্গে এভাবেই চিরাচরিত শব্দ আমাদের জিভে, আঙুলে লাভ করেছে। প্রথম দিকে একটু খটকা লাগে ঠিকই। কিন্তু অভ্যেস আমাদের খাপে খাপ করে দেয়। তাই আজকের 'জেন-ওয়াই' এর মুখে যদি 'তোর মনের পাসওয়ার্ডটা আজও জানা হল না'-র মতো শব্দ শুনি, আমাদের উত্তরও ঠিকই সিগন্যাল দেয়।

কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে সিনিয়ররা জুনিয়রদের আজও নিয়মিত র‍্যাগিং হলেও করে। আমরা বলতাম, 'ওই চটিতে আসছে রে!' কেউ কম নম্বর পেয়েও ধনার্ঘ পেয়ে গেলে অনায়াসে বলে দেওয়া 'আপনা আছে' বা 'সেটিং আছে'। অর্থাৎ টাকা-পয়সার সমঝোতা আছে। ইয়ো সেশনে এক বান্ধবীকে দেখিয়ে পাশের বান্ধবী বলে ওঠে, 'দাদা, অরুনা ভালো গান করে।' আর অরুনা গট করে বলে গেল, 'দিদি তো চপসি করে!' পরে জানতে পারি, চপসি শব্দটার অর্থ হল কাউকে অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলা। যেমন আমার গান শুনে এক সিনিয়র এসে জানায়, 'তোর দিয়াটা সাবিত্রী রে ভাই।' প্রতিভা বলল কি? নাহ, ভুল শুনিনি, সা-বি-ত্রী। কিন্তু এর মানেটা কী? সিটি খুলছে না। প্রেস্টিজ পাংচার হওয়ার ভয়ে মুখটাও সংযত করে রাখতে হচ্ছে। বায়োলজির এক দাদাই একদিন শিক্ষা পাঠায়। ক্লাসিক্স সাবিত্রী একটি পাহাড়ি গাছ। এই শব্দের মতো দেখতে গাছের শুকনো পাতা হল তার বা সিদ্ধি। আর এর ওঁড়া পাতা ও ফুলের রস শুকিয়ে গুলি করে হয় চরস। গাছই কথা কুঁড়ি বলা অংশের আটা থেকে হয় হাশিশ। তাহলে আমার গান শুনে সেদিন ওই দাদার নেশা ধরে গিয়েছিল, মানে কিক হয়ে গিয়েছিল— এই দাঁড়াচ্ছে? না আমাকে ফুট অর্থাৎ বাড় খাইয়েছিল?

আমাদের দেশে গাঁজা টানার সঙ্গে ধর্ম-কর্মের পুরো ছাপ্পু। বৈষ্ণবদের ছোট কলকে 'চিলি', গাঁজা কাটার ছুরি 'রতনকাটারি', যে কাঠের টুকরোর ওপর রেখে গাঁজা কুচানো হয় তা 'প্রেম ঢেঁকি'। আর কলকের তলায় জড়ানো কাপড়ের টুকরো হল 'সাফি'। এই সিনিয়রের মুখেই শুনেছি আরেক বন্ধুর প্রেম সম্পর্কে এমন কমেন্ট করতে, 'কোথায় আর যাবে দাদা, হয়তো কোনাকিন সাফি হয়ে কোন কোণে লটকে আছে।'

আমার মতো ভালবাসিকে শিখতে 'সাফি'র ব্যাখ্যা করতে হয়েছিল বৈকি। এইসব শুনি কেনো অনেকের কেন জটিল হয়ে যাওয়ার খবর পেতাম। 'আমার বন্ধুরা অনকাড়ি যায় / আমার প্রাক্তন বিয়া'-র মতো গরিমায় বন্ধুকে প্রেম দিতাম এই বলে, 'দাঁত ঘাটিয়ে!' এক হ্যাণ্ডু সিনিয়রকে দেখে এক বান্ধবী হাঁ হয়ে দেখছে। আমরা যে হাসাহাসি করছি সে খেয়াল নেই। আর এক বান্ধবী হাতকা টান দিয়ে বলে, 'ক্যাবলাটাকে দিয়ে তো মহাজ্বালা দেখছি।' বন্ধু হয়ে আর এক বন্ধুর রিলেশনশিপ কাঁচি করে দেওয়ার ঘটনাও বিরল না। ফিল্ডিং মারা, চুমাচাটি, বিনে পয়সা সিনেমা, ঝিংকু মামণি, একঘর দেখতে— সবই প্রেমের রকমারি শব্দ। সেদিন বাইকে কেত মারতে গিয়ে এক বন্ধু পা ভেঙে ফেলেছে। নিজেই ফোন করে বলছে, 'পুরো খাম হয়ে গেলাম রে পাগলা!'

> **বন্ধু হয়ে আর এক বন্ধুর রিলেশনশিপ কাঁচি করে দেওয়ার ঘটনাও বিরল না। ফিল্ডিং মারা, চুমাচাটি, বিনে পয়সা সিনেমা, ঝিংকু মামণি, একঘর দেখতে—সবই প্রেমের রকমারি শব্দ। সেদিন বাইকে কেত মারতে গিয়ে এক বন্ধু পা ভেঙে ফেলেছে। নিজেই ফোন করে বলছে, 'পুরো খাম হয়ে গেলাম রে পাগলা!'**

শব্দ নিয়ে এমন বাওয়াল নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের মধ্যেই বেশি দেখা যায়। কার আস্তিনায় যে প্রথম এমন কথা দেয়, জানা যায় না। মুখে মুখে চালু হয়ে পড়ে। 'ওইসব চুনিয়া-মুনিয়া দিয়ে কি সংসার হবে?' কেউ যেন কানের মধ্যে সুরেলা বাঁশির শব্দ ঢেলে দিল। পাত্রী সম্পর্কে কণিকা বিশ্বাস বললেন বুঝলাম 'চুনিয়া-মুনিয়া' আসলে বিয়ের জন্য বয়সে অল্পবিলম্ব মেয়ে। বাপকা খাঁটি খ, একেবারে ধুলুক্কি মস্তি, মাটি, চিচটিং, সেন্টু, ফেচকে, কাফেনি কত এমন শব্দই না উঠেছিল ব্যবহার হচ্ছে। শব্দের নতুন ট্রেন্ড এসে হয়তো এদের অনেকগুলির ওপরই ধুলো জমিয়ে দেবে। প্রসঙ্গত মনে আসে ঝিলিমিলি শব্দের কথা। গ্রামীণের খাবার প্রতিশব্দ হিসাবে আমাদের ছোটবেলা শব্দটা ব্যবহৃত হত। আমাদের এখন মনের তার যেন ঝিলিমিলির ছোট থেকে এই ঝিলিমিলির জন্য দেখে উঠত। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অর্ধেক জীবন' উপন্যাসে স্মৃতিচারণা আছে, 'ঝিকিমিকি' শব্দটাকে সেই শব্দান্তের সঙ্গে খাবাদান হিসাবেই ব্যবহার করা হত। এখন অবশ্য তা হয় না।

বিখ্যাত ব্যক্তিদের কথা মনে আসে। তাঁর কথায়, কোনও শব্দ মৌখিকভাবে ব্যবহৃত না হলে তার কোনও অস্তিত্বই নেই। আর তা লেখার আকারে এলে, বক্তার চরিত্রকেও বহন করে থাকে। অর্থাৎ নতুন শব্দ মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়লে তাকে স্বাগত। স্বর্ণজিৎ চক্রবর্তীর 'দাবিদের শহরে যেমন' উপন্যাসে কবীরকে বোলো জানায়, 'কী রে, একটু নট সেটিয়েছে বলেই এমন ফোকাস মিলিয়ে গেল আছ? তাও তো শিখলে টুমি খাচ্ছেলি?' একটি মজা পেলাম ফেসবুকে কয়েকটি শব্দ দেখে। যেমন 'দুঃস্বামীবন্ধু', 'চুলবোয়ার', 'ভণ্ডবাবাজক'। এমন ক্রিয়েটিভিটিকে তারিফ করতেই হয়।

এই বলছি কাকা, কাকার কাজকারবারটা দেখে চমকে যেতো হয়ো খুশি শাকালে ঠিক চলে না। এইসব আরবা নিয়েই তো আমার ফুল হাল পাকেজ। মাখতে পারলে খামাখাকর সুখ। উল্লাস!

প্রমথ চৌধুরীর লেখা পড়েই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নজরুলের ভুল ভাঙে

পঙ্কজ বিশ্বাস

৪ সেপ্টেম্বর ১৯২১, কলকাতার একটি পাবলিক সভা। রবিঠাকুরের জন্মের ষাট বৎসর পূর্তি উপলক্ষে এই কবি সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। আয়োজক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। অনুষ্ঠান শুরুর মুহূর্তে মঞ্চে উপবিষ্ট রবীন্দ্রনাথের কাছে এগিয়ে গেলেন নজরুল। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। ফিরে আসবেন, কিন্তু হঠাৎ তাঁর হাত টেনে ধরলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। সকলের সামনে বললেন—না নজরুল, তুমি নীচে নয়, তুমি এই সভায় আমার পাশের আসনে বস। উপস্থিত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিকের এই দৃশ্য ঠিক কেমন লাগছিল? বাইশ বছর বয়সী নজরুলের তো কয়েকটি মাত্র কবিতা পত্রিকার পাতায় বেরিয়েছে। আর উপস্থিত অনেকে নজরুলকে চেনেনও না। অন্যদিকে তাঁরা নিজেরাই তো প্রায় ডাকসাইটে কবি। এই সম্মান তাঁদের না জুটে জুটল কিনা এই অর্বাচীনের!

নজরুলের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাব জানতে গেলে আমাদের আরও একটু পিছনের দিকে ফিরে যেতে হবে। ১৯১৭ সাল নাগাদ ৪৯ নং বাঙালি পল্টনে সেনা হিসাবে যোগ দেন নজরুল। এক সময় হাবিলদার পদে উন্নীত হয়ে করাচিতে অবস্থান করেন। 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় নজরুলের কবিতা, গল্প প্রকাশিত হতে থাকে। সেই সময়ের শান্তিনিকেতনে সুধাকান্ত রায়চৌধুরী 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বিদেশ থেকে ফিরে এলে সম্ভবত সুধাকান্তই নজরুলের কবিতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রবীন্দ্রনাথ বিস্মিত হন নজরুলের কবি প্রতিভায়। বিভিন্নজনের কাছে সেই বিস্ময়, ভালোলাগা ব্যক্তও করেন। যেমন, প্রথম পরিচয়ে নজরুল সত্যেনদার পায়ের কাছে মাথা নিচু করে, পায়ে হাত দেবার আগেই সত্যেনদা জড়িয়ে ধরেন কাজীকে, বলেন, তুমি ভাই, নতুন ঢেউ এনেছ, আমরা তো নগণ্য, গুরুদেবকে পর্যন্ত বিস্মিত করেছ তুমি।' এই তথ্য আছে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের 'চলমান জীবন' নামের রচনায়।

রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে ১৯২১-এর আগস্টের মাঝামাঝি। 'জোড়াসাঁকোর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবার সময় তেমন বড়লোককেও সমীহ করে যেতে দেখেছি,— অতি বাকপটুকে ঢোক গিলে কথা বলতে শুনেছি— কিন্তু নজরুলের প্রথম ঠাকুরবাড়িতে আবির্ভাব সে যেন ঝড়ের মতো। অনেকে বলত, তোর এসব দাপাদাপি চলবে না জোড়াসাঁকোর বাড়িতে, সাহসই হবে না তোর এমনিভাবে কথা কইতে। নজরুল প্রমাণ করে দিল যে সে তা পারে। তাই একদিন সকালবেলা— 'দে গরুর গা ধুইয়ে' এই রব তুলতে তুলতে সে কবির ঘরে গিয়ে উঠল— কিন্তু তাকে জানালো বলে কবি বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট হলেন না।' সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণা 'আমাদের নজরুল' গ্রন্থে এই কথা পাওয়া যাচ্ছে।

এরপর কলকাতা, শান্তিনিকেতন, দার্জিলিং-এ দু'জনের একাধিকবার সাক্ষাৎ ঘটে। বিভিন্ন মানুষের স্মৃতিচারণায় তাঁদের আলাপের কথা পাওয়া যায়। কখনও নিজে থেকে উৎসাহী হয়ে, কখনও রবীন্দ্রনাথের কথায় নজরুল রবীন্দ্রনাথকে গান, কবিতা শোনাতেন। 'গুরুজি' তাঁর 'উদ্দাম'-এর প্রতিভাকে স্বীকৃতি দিতে কখনও সংকোচ করেননি। বরং তাঁর সৃষ্টিকর্মে উৎসাহ জুগিয়েছেন। তাই দেখা যায় নজরুলের সম্পাদনায় ১১ আগস্ট ১৯২২ নতুন অর্ধসাপ্তাহিক কাগজ 'ধূমকেতু' বেরোলে রবীন্দ্রনাথ লিখে আশীর্বাদ জানাচ্ছেন। যা পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় পত্রিকানামের নীচেই স্থান পায়। এই পত্রিকার দ্বাদশ সংখ্যায় (২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২২) প্রকাশিত হয় 'আনন্দময়ীর আগমনে'। রাজদ্রোহের অপরাধে গ্রেফতার হন নজরুল। সেই সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর নতুন গীতিনাট্য 'বসন্ত' উৎসর্গ করেন নজরুলকে। শুধু তাই নয়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের হাত দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই বইয়ের দুটো কপি নজরুলের জন্য পাঠান। বলতে বলেন, তিনি নিজের হাতে দিতে পারলেন না বলে যেন নজরুল দুঃখ না করে। তিনি তাঁকে সমগ্র অন্তর দিয়েই তাঁকে আশীর্বাদ করছেন। নজরুল যেন কবিতা লেখা বন্ধ না করে ইত্যাদি। উল্লেখ্য, সেই সময়ের কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে এই উৎসর্গের বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। অনেকে ঈর্ষাবোধ করেন। হুগলি জেলে থাকাকালীন নজরুল দীর্ঘদিন অনশনে বসলে রবীন্দ্রনাথ শিলং থেকে নজরুলকে টেলিগ্রাম পাঠান। 'Give up hunger strike, our literature claims you.' যদিও সেই টেলিগ্রাম নজরুল পাননি। আবার ১৯২৫ এর ২৫ ডিসেম্বর নজরুল 'লাঙ্গল' পত্রিকা প্রকাশ করলে রবীন্দ্রনাথ লিখে দিলেন, 'ধর হাল বলরাম আন তব মরু-ভাঙা হল'। যা পত্রিকার ললাট লিপিতে স্থান পায়।

'যাই বলুন, এ অসির ঝনঝনা জাতির মনের আবেগে ভাঁটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই নজরুলী কাব্যের জনপ্রিয়তা মিলিয়ে যাবে।' অমল হোম মশাইয়ের এই মনোভাবের জবাবে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন, 'জনপ্রিয়তা কাব্য-বিচারের স্থায়ী নিরিখ নয়, কিন্তু যুগের মনকে যা প্রতিফলিত করে, তা শুধু কাব্য নয়, মহাকাব্য।' এইরকমই ছিল নজরুল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ এবং সমকালীন রবীন্দ্রবৃত্তের মানুষদের মনোভাব। নজরুল কিন্তু একটা সময় পর এই রবীন্দ্রনাথকেই ভুল বুঝলেন। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুখে শোনা যাক সেই ইতিহাসের কথা। 'যাত্রী' নামের বইয়ে তিনি জানাচ্ছেন, 'সেদিন সকালে আমি আর নজরুল দু'জনে গিয়েছিলাম রবীন্দ্রনাথের কাছে। নজরুলকে তাঁর স্বরচিত গান শোনাতে বললেন রবীন্দ্রনাথ। নজরুল গাইলে 'চল-চঞ্চল বাণীর দুলাল', 'ধ্বংসপথের যাত্রীদল' আর 'শিকলপরা ছল'। রবীন্দ্রনাথ খুশি হলেন গান শুনে। ...সেদিন দু'চারটে কথার পর নজরুলকে বললেন— শুনেছি তুমি নাকি মন যোগানো লেখা লিখতে শুরু করেছো। বিধাতা তোমাকে পাঠিয়েছেন তরোয়াল হাতে, সে তরোয়াল কি তিনি তোমার হাতে দিয়েছেন দাড়ি চাঁচবার জন্য?' রবীন্দ্রনাথের এই কথাগুলি নিয়ে নজরুল একটি কবিতাও লিখেছিলেন। 'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থের 'আমার কৈফিয়ৎ'। 'গুরু কন, তুই করেছিস শুরু তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাঁছা'। আসলে নজরুল রবীন্দ্রনাথের কথার গূঢ়ার্থকে ধরতে পারেননি। 'তরোয়াল দিয়ে দাড়ি চাঁছা'র নিষেধের মধ্যে আসলে রবীন্দ্রনাথ নজরুলের স্বতোৎসারিত মৌলিক কবিতা প্রতিভাকে উৎসাহিত করতে চেয়েছেন।

নজরুলের এই ভ্রান্তির এখানেই সমাপ্তি ঘটেনি। প্রবাসী-অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ সংখ্যায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যে নবত্ব' ও রবীন্দ্র পরিষদে রবীন্দ্র সংবর্ধনায় কবির অভিভাষণকে কেন্দ্র করে নজরুলের মনোভাব রবীন্দ্রনাথের প্রতি আরও বিষিয়ে ওঠে। 'সাহিত্যে নবত্ব'-এ আছে, 'অন্যান্য সকল বেদনার মতোই সাহিত্যে দারিদ্র্য বেদনারও যথেষ্ট স্থান আছে। কিন্তু ওটার ব্যবহার একটা ভঙ্গিমার অঙ্গ হয়ে উঠেছে যখন, তখন সেই প্রয়াসের মধ্যে লেখকেরই শক্তির দারিদ্র্য প্রকাশ পায়। 'আমরাই রিয়ালিটির সঙ্গে কারবার ক'রে থাকি, আমরাই জানি কাকে বলে লাইফ' এই আস্ফালন করবার ওটা একটা সহজ এবং চলতি প্রেসক্রিপশনের মতো হয়ে উঠেছে। অথচ এঁদের মধ্যে অনেকেই দেখা যায় নিজেদের জীবনযাত্রায় 'দরিদ্র নারায়ণে'র ভোগের ব্যবস্থা বিশেষ কিছুই রাখেননি, ভালো রকম উপার্জনও করেন, সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যেও থাকেন, দেশের দারিদ্র্যকে এঁরা কেবল নব্য সাহিত্যের নূতনত্বে ঝাঁজ বাড়াবার জন্যে সর্বদাই ঝালমশলার মতোই ব্যবহার করেন। এই ভাবুকতার কারি পাউডারের যোগে একটা কৃত্রিম সস্তা সাহিত্যের সৃষ্টি হয়ে উঠেছে। এই উপায়ে কিনা প্রতিভায় এবং অল্প শক্তিতেই বাহবা পাওয়া যায়, এই জন্যেই অপটু লেখকের পক্ষে এ একটা মস্ত প্রলোভন এবং অবিচারক পাঠকের পক্ষে একটা সাহিত্যিক অপথ্য।' প্রসঙ্গত নজরুলের 'সিন্ধু হিল্লোল' কাব্যগ্রন্থের 'দারিদ্র্য' কবিতাটির কথা মনে পড়বে। তাছাড়া জন্ম থেকে দারিদ্র্যের কশাঘাত নজরুল তো কোনোদিনই রেহাই দেয়নি। অর্থাৎ নজরুলের সেন্টিমেন্টে লাগে। আর রবীন্দ্র পরিষদের অভিভাষণে বলা কবির কথায় নজরুল যেন আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'সৃষ্টিশক্তিতে যখন দৈন্য ঘটে তখন মানুষ তাল ঠুকে নূতনত্বের আস্ফালন করে। পুরাতনের পাত্রে নবীনতার অমৃতরস পরিবেশন করবার শক্তি যাদের নেই তারা শক্তির অপূর্বতা চড়া গলায় প্রমাণ করবার জন্যে সৃষ্টিছাড়া অদ্ভুতের সন্ধান করতে থাকে। সেদিন কোনও একজন বাঙালি হিন্দু কবির কাব্যে দেখলুম, তিনি রক্ত শব্দের জায়গায় ব্যবহার করেছেন 'খুন'। পুরাতন রক্ত শব্দে তাঁর কাব্যে রাঙা রং যদি না ধরে তা হলে বুঝব সেটাতে তাঁর অকৃতিত্ব। তিনি রঙ লাগাতে পারেন না বলেই তাক লাগাতে চান। নতুন আসে অকস্মাতের খোঁচা দিতে, নবীন আসে চিরদিনের আনন্দ দিতে।'

নজরুলের মনে পড়ল কদিন আগেই তিনি তাঁর '[illegible]' [illegible] শুনিয়ে এসেছেন কবিকে। [illegible] জায়গায় 'রক্ত' শব্দের [illegible] প্রয়োগ আছে। তাছাড়া তিনি তাঁর [illegible] আরবি-ফার্সি শব্দের যথেষ্ট ব্যবহার করে থাকেন। তাঁর মনে হল, কবিগুরুর লক্ষ্য যেন স্বয়ং তিনিই। উল্লেখ্য কবির অভিভাষণ প্রসঙ্গে 'বাংলার কথা' ২১ ডিসেম্বর ১৯২৭ সংখ্যায় বিকৃত তথ্য পরিবেশিত হয়েছিল।

নজরুলের আক্রোশ প্রকাশিত হয় ৩০ ডিসেম্বর ১৯২৭-এর সাপ্তাহিক 'আত্মশক্তি'-তে, 'বড়র পীরিতি বালির বাঁধ' রচনায়। 'আমার একটা গান আছে— 'উদিবে সে রবি আমাদেরই খুনে রাঙিয়া পুনর্বার।' এ গানটি সেদিন কবিগুরুকে দুর্ভাগ্যক্রমে শুনিয়ে ফেলেছিলাম এবং এতেই হয়তো তাঁর ও-কথার উল্লেখ। তিনি 'রক্তের' পক্ষপাতী। কিন্তু ওতে ওর অর্ধেক ফোর্স কমে যেত। আবার, 'ওর আমাদের উদ্দেশ্য করে আজকালকার লেখাগুলোর সুর শুনলে মনে হয়, আমাদের অভিশপ্ত জীবনের দারিদ্র্য নিয়েও যেন তিনি বিদ্রুপ করতে শুরু করেছেন। তাঁর কাছে নিবেদন, তিনি যত বাণ নিক্ষেপ করুন, তা হয়তো সইবে, কিন্তু আমাদের একান্ত আপনার এই দারিদ্র্য যন্ত্রণাকে উপহাস করে যেন আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে না দেন। শুধু ওই নির্মমতাটাই সইবে না।'

প্রবন্ধটি সেদিনের পাঠক সমাজে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। তাঁর এই প্রবন্ধের বিরুদ্ধ সমালোচনা করে 'শনিবারের চিঠি' (মাঘ ১৩৩৪/১৯২৮) মন্তব্য করে, 'আত্মশক্তিতে কাজী প্রলাপ পড়িলাম। নজরুল ইসলাম সাহেব একসময় রবীন্দ্রনাথের একান্ত স্নেহভাজন ছিলেন ও এখন সে স্নেহ বিনা দোষে হারাইয়াছেন, এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া কাজী সাহেব বলিয়াছেন— বড়র পীরিতি বালির বাঁধ। ব্যাপার দেখিয়া আমাদেরও বলিতে ইচ্ছা হইতেছে, ছোটর পীরিতি গলার ফাঁস।' এমতাবস্থায় প্রমথ চৌধুরী আসরে নামেন। 'আত্মশক্তি' পত্রিকার ২০ মাঘ ১৩৩৪ (৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮) সংখ্যায় তিনি তাঁর মতামত জানান। 'রবীন্দ্রনাথ যে কাজিসাহেবকে লক্ষ করে এ-কথা (রক্তকে খুন বলা) বলেছেন— এ সন্দেহ আমার মনে উদয় হয়নি, যদি যে সভায় তিনি ও কথা বলেন সে সভায় আমি উপস্থিত ছিলুম। যতদূর মনে পড়ে কোনও উদীয়মান তরুণ কবির নবীন ভাষার উদাহরণ স্বরূপ তিনি 'খুনে'র কথা বলেন। কোনও উদিত কবির প্রতি তিনি কটাক্ষ করেননি।' আরবি-ফার্সি শব্দের প্রয়োগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'কাজিসাহেব এই বলে দুঃখ করেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ বাংলাভাষার অন্দরে আরবি ফার্সি শব্দের প্রবেশের দ্বাররুদ্ধ করতে চান। কাজিসাহেবের এ বিলাপ প্রলাপমাত্র। কেন না যদি তাঁর ওরকম কোনও মতলব থাকত তাহলে তিনি বহুপূর্বে আমার ভাষার ওপর খড়্গহস্ত হতেন। বীরবলী ভাষা যে সাহিত্যে এক ঘরে, এমন কি সংবাদপত্রেও আর পাঁচজনের ভাষার সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে তা বসতে পারে না, তার প্রধান কারণ যে সে ভাষা শব্দ সম্বন্ধে untouchability মানে না।'

নজরুল মন দিয়ে পড়েছিলেন এই প্রবন্ধ। নিজের ভুল বুঝতে পারেন। তাই তো দেখা যায় প্রমথ চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে যাচ্ছেন। নিজের কৃতকর্মের জন্য দুঃখপ্রকাশ করছেন। রবীন্দ্রনাথও কাছে টেনে নেন নজরুলকে। ১৯২৮-এর ১৪ অক্টোবর প্রকাশিত নিজের কবিতা সংকলন 'সঞ্চিতা' নজরুল উৎসর্গ করছেন তাঁর কবিগুরুকেই। কাকতালীয় হলেও এটা ঘটনা—দু'জনের সম্পর্কের নৈকট্যের মতোই দু'জন জন্ম নেন মে মাসে, দু'জনের মহাপ্রয়াণও আগস্ট মাসে। রবীন্দ্রনাথের তিরোধান ঘটে ৭ আগস্ট ১৯৪১। ওইদিন 'রবিহারা' কবিতা ও 'ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত রবিরে' গান লিখে আকাশবাণীতে দুপুরে ও সন্ধ্যায় পরিবেশন করলেন নজরুল। আত্মীয় বিচ্ছেদের বেদনা ধ্বনিত হল তাঁর কণ্ঠে। শোনা যায়, গানটি নজরুল শোকমিছিলে স্বকণ্ঠে পরিবেশনও করেছিলেন। আর এই ঘটনার এক বছর পর, ৯ জুলাই ১৯৪২-এ আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে কথা বলতে বলতে অসুস্থ হয়ে পড়লেন নজরুল। দেশে-বিদেশে চিকিৎসার ব্যবস্থা হলেও আর সুস্থ হয়ে উঠতে পারলেন না। বাংলা সংস্কৃতির ইতিহাসে সেদিন এটা ছিল একদম অভাবিত ঘটনা। প্রসঙ্গত মনে পড়বে কাজী মোতাহার হোসেনকে লিখিত নজরুলের একটা চিঠির কথা (২৪ জানুয়ারি ১৯২৮)। 'রবীন্দ্রনাথ আমায় প্রায়ই বলতেন, দেখ উন্মাদ, তোর জীবনে শেলীর মতো, কীটসের মতো খুব বড় একটা tragedy আছে, তুই প্রস্তুত হ।' গুরুদেবের ভবিষ্যদ্বাণীই সত্যি হল কিনা অবশেষে!

নিবেদিতার জন্যই রবীন্দ্রনাথ গোরাকে ঢেলে সাজিয়েছিলেন

৩০ ডিসেম্বর, ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দ। সিস্টার ক্রিস্টিনকে নিয়ে নিবেদিতা শিলাইদহে পাড়ি দিলেন। রবীন্দ্র আতিথ্যে শিলাইদহে তখন জগদীশচন্দ্র বসু এবং অবলা বসু। শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর 'পল্লির মানুষ রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে শিলাইদহ এস্টেটের কর্মচারী দক্ষিণারঞ্জন চৌধুরীর স্মৃতিচারণায় রবীন্দ্র-নিবেদিতার কথা জানা যাচ্ছে। এই সময় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নিবেদিতা গ্রাম পরিদর্শনে যেতেন। রবীন্দ্রনাথের বজরাতে গিয়েও নিবেদিতা বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা, গল্প করতেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে গানও শোনাতেন। এমনই একটি গান, 'প্রতিদিন আমি, হে জীবনস্বামী, দাঁড়াব তোমার সম্মুখে'। আবেগ বিহ্বল হয়ে নিবেদিতা ধ্যানস্থ হয়ে সেই গান শুনেছিলেন।

একদিন নিবেদিতা কবির কাছে একটি মৌলিক গল্প শুনতে চাইলেন। হাউসবোটের ডেকে বসে কবি শোনালেন এক আইরিশ যুবকের কাহিনি। সেই যুবক নিজেকে ভারতীয় জেনে, হিন্দু জেনে জাতীয়তাবোধে দেশের মানুষকে জাগিয়ে তুলতে চায়। কিন্তু একদিন সে জানতে পারে আসলে সে ভারতীয় নয়, আইরিশ। হিন্দুও নয়, খ্রিস্টান। তবু সে নিজেকে একজন ভারতবাসী মনে করে এ দেশের কল্যাণে নিজেকে সঁপে দেয়। কিন্তু বিদেশি পরিচয়ের জন্য তাঁর প্রেমিকা ও শিষ্যা তাকে প্রত্যাখ্যান করে। এই কাহিনি আসলে 'গোরা' উপন্যাসের। যদিও উপন্যাসের শেষের সঙ্গে এই কাহিনি মিলছে না।

নিবেদিতার নিজের জীবনের দিকে তাকালেও তো দেখা যায় গোরার সঙ্গে তাঁর মিল রয়েছে। গোরার মতোই নিবেদিতা আইরিশ সন্তান। স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে তিনি ভারতবর্ষে আসেন। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের নিবেদিতা হয়ে তিনি এই দেশের হিতে জীবন উৎসর্গ করেন। লোকসেবা, মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় প্রেরণা দান, দেশের সংস্কৃতি পুনরুদ্ধারে নিরলস প্রয়াস একজন বিদেশির পক্ষে এইসব কর্মকাণ্ড আমাদের বিস্মিত করে। সেই বিস্ময় রবীন্দ্রনাথেরও। 'ভগিনী নিবেদিতা'-য় লিখেছেন সেই কথা।

তাহলে গোরাকে প্রত্যাখ্যান কেন!

নিবেদিতা অপমানিত বোধ করেছিলেন। কবির কাছে তাঁর দাবি ছিল, গোরা ও সুচরিতাকে মিলিয়ে দিতে হবে। বনফুল তাঁর 'রবীন্দ্রস্মৃতি'তে কবির উক্তিতে লিখেছেন, 'গল্পটা ধারাবাহিকভাবে প্রবাসীতে বেরোচ্ছিল। কিন্তু ওটা আগেই লেখা হয়ে গিয়েছিল আমার। নিবেদিতা তখন বলল, গোরার শেষটা কী রকম হবে করেছেন দেখি। দেখালাম। পড়েই সে বলে উঠল, না না, এরকম হতে পারে না। ওদের মিলন না হলে বড়ই নিদারুণ ব্যাপার হবে যে। বাস্তব জগতে যা ঘটে না কাব্যের জগতেও কবি সেটা ঘটিয়ে দেবেন না? কাব্যেরও জগৎ তো আপনার সৃষ্টি, ওখানে আপনি অত নিষ্ঠুর হবেন না। ওদের মিলন ঘটিয়ে দিন। দিতেই হবে, এমন জেদ করতে লাগল যে রাজি হতে হল। সবটা আবার ঢেলে সাজালাম।'

নিবেদিতার জেদের জন্যই কি কবি গোরার সমাপ্তিকে বদলে দিয়েছিলেন? না, নিজেরও তাতে সায় ছিল! 'সায়'-এর পক্ষে বলা যায়, গোরার সমাপ্তি রবীন্দ্র-আদর্শের সঙ্গে বেশ খাপ খায়। কেননা, রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষকে জানতেন 'মহামিলনের সাগরতীর' বলে। ভারতাত্মার বাণীই হল, এসো হয়ে আর্য এসো অনার্য হিন্দু মুসলমান / এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ এসো এসো খ্রিস্টান...।' সুচরিতার প্রত্যাখ্যানই যদি উপন্যাসে গাঁথা থাকত, তাহলে প্রেম, ঔদার্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারত কি! আর গোরা-সুচরিতার মিলন যেমন ব্রাহ্ম-হিন্দুর মিলন, তেমনই ভারতীয়-অভারতীয়ের মিলন, সাদা-কালোর বর্ণসম্মিলনও। মনে হয় রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতার প্রস্তাবে খুশিই হয়েছিলেন। একটা উপন্যাসকে 'ঢেলে সাজানো'র মতো কঠোর পরিশ্রম শুধুমাত্র কারও 'জেদ'কেই মেনে নিয়ে করবেন, এমনটা ভাবতে মন চায় না।

আর নিবেদিতার 'জেদ'-এর শক্তি কতটা?... কারও জেদকে তো আমরা তখনই পাত্তা দিই, যেখানে 'সম্পর্ক' বলে একটা কথা থাকে!

প্রথম পরিচয়ে নিবেদিতা রবীন্দ্রনাথের চেহারা ও ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হয়েছেন বলে নিবেদিতার ডায়ারি থেকে জানা যাচ্ছে। আর রবীন্দ্রনাথ? 'আমি ভাবিয়াছিলাম সাধারণত ইংরেজ মিশনারি মহিলারা যেমন হইয়া থাকেন ইনিও সেই শ্রেণির লোক, কেবল ইহার ধর্মসম্প্রদায় স্বতন্ত্র।' আর এই মনোভাবেই কি কবি মেয়ে মীরার শিক্ষার দায়িত্ব তিনি নিবেদিতাকে নিতে বলেছিলেন? কেননা কবি ইংরেজি ভাষাটা ইংরেজদের কাছ থেকে শেখাটাই সমর্থন করতেন। নিবেদিতা রাজি হননি। লিজেল রেমঁ লিখিত নিবেদিতার জীবনী গ্রন্থে তাঁর প্রত্যাখ্যানের ভাষা, ঠাকুরবাড়ির ছেলে হয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতায় আপনি এমনই আবিষ্ট হয়েছেন নিজের মেয়েকে ফোটবার আগেই নষ্ট করতে চান?' দু'জনের সম্পর্ক যে ক্রমে গভীর হৃদ্যতায় পরিণত হয় তার সমর্থন আছে লিজেল উক্ত জীবনীতেই।

এই ঘনিষ্ঠতা থেকেই নিবেদিতা একটি পরিকল্পনা করেন। যদি ব্রাহ্মসমাজের শিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায়কে রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনে আকৃষ্ট করা যায়! রবীন্দ্রনাথ তখন আদি ব্রাহ্মসমাজের জ্যেষ্ঠ সম্পাদক। স্বামীজিরও এই পরিকল্পনায় সমর্থন ও উৎসাহ ছিল। সেই উদ্দেশ্যে নিবেদিতাকে একটি টি-পার্টির আয়োজন করতে বলেন। এই টি-পার্টিটি অনুষ্ঠিত হয় নিবেদিতার বাগবাজারের বাসায়। রবীন্দ্রনাথ, নিবেদিতা, বিবেকানন্দ মুখোমুখি বসে এখানে কথা বলেন। এই আসরের কথা কোথাও লিপিবদ্ধ নেই। ৩১ জানুয়ারি, ১৮৯৯ ম্যাকলাউডকে লেখা চিঠিটিই একমাত্র জানার অবলম্বন। নিবেদিতা জানিয়েছেন, এ-এক চমৎকার ক্ষুদ্র সমাবেশ, মি. টেগোর তাঁহার মনোরম চড়া সুরে তিনটি গান পরিবেশন করিলেন এবং স্বামীজি ছিলেন অনবদ্য। কিন্তু যে উদ্দেশে এই আয়োজন তা সফল হয়নি। রবীন্দ্র ভাবাদর্শের সঙ্গে রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের যে অনেক দিক থেকেই অমিল।

আদর্শগত বিরোধই কি তাহলে স্বামীজির 'ঠাকুর পরিবার' বিমুখতার কারণ? সেই অপছন্দের বীজ শিষ্যা নিবেদিতার মনেও তাই বুনে দিতে চান? ১২ মার্চ মিস ম্যাকলাউডকে নিবেদিতা লিখছেন, বিবেকানন্দ তাঁকে নাকি বলেছেন, 'মার্গটি, তুমি যতদিন ওই ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে তোমার মেলামেশা চালিয়ে যাবে ততদিন আমাকে বারবার সাবধান করে যেতেই হবে। মনে রেখো, ওই পরিবার বঙ্গদেশকে শৃঙ্গাররসের বন্যায় বিষাক্ত করেছে।' যাকে উদ্দেশ্য করে বিবেকানন্দ এই কথা বলতে পারেন, তিনি রবীন্দ্রনাথ হতে পারেন। হতে পারেন ঠাকুর পরিবারের অন্যান্য সদস্য। কিন্তু নিবেদিতা তাঁর গুরুর কথা কতখানি মেনেছিলেন? ২৩ মার্চ, ১৮৯৯-এ মিস ম্যাকলাউডকে তিনি লিখছেন, 'আমি যখন একটা ছুটি নিই, তখন ঠাকুরবাড়ি যাওয়াটাকেই বেছে নিই।'

স্বামীজি বিলেত গেলে কয়েকদিন শিলাইদহ কাটিয়ে আসবেন ঠিক করলেন নিবেদিতা। তবে এই যাত্রায় তাঁর সেখানে যাওয়া হল না। স্বামীজির সঙ্গে ২৪ জুন ১৮৯৯ তিনি বিলেতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। বিদেশের মাটিতে বসে বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের উৎসাহে ও সান্নিধ্যে তিনি রবীন্দ্রনাথের তিনটি ছোটগল্প অনুবাদ করেন। 'দ্য কাবুলিওয়ালা', 'গিভিং অ্যান্ড গিভিং', 'লিভ অফ অ্যাবসেন্স'। যা কিনা রবীন্দ্রগল্পের প্রথম অনুবাদ বলে স্বীকৃত। ১৯০২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি বিদেশ থেকে নিবেদিতা ফেরেন। এর পাঁচ মাস পর ৪ জুলাই স্বামীজির মহাপ্রয়াণ ঘটে। ১৯ জুলাই রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে ঘোষিত সম্পর্ক ছেদ করলেন তিনি।

বিবেকানন্দের প্রয়াণ আপাতভাবে রবীন্দ্রনাথ-নিবেদিতার সম্পর্কের প্রশস্ত ক্ষেত্র বলে মনে হলেও কার্যত তা হয়নি। নিবেদিতার উগ্র দেশপ্রেম ও সশস্ত্র আন্দোলনও রবীন্দ্রনাথ পছন্দ করেন না। অন্যদিকে নিবেদিতার অপছন্দের কারণ ছিল কবির কন্যাদের অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়া, মেম টিচার নিয়োগ করা, উগ্র জাতীয়তাবাদকে সমর্থন না করা। কিন্তু সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডে, সাহিত্য-সংগীতের রুচিতে দু'জনে মিলেছিলেন। জানা যায়, 'সায়েন্স ম্যান' জগদীশচন্দ্রের জন্য এক চিঠিতে নিবেদিতা রবীন্দ্রনাথের কাছে অর্থ সাহায্য চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার মহারাজের কাছে এই অর্থের জন্য হাত পেতেছিলেন।

১৯০৪-এর ৮ অক্টোবর কুড়িজনের একটি দল বুদ্ধগয়া ভ্রমণে যায়। রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র এই যাত্রায় ছিলেন। নিবেদিতার এই ভ্রমণ পরিকল্পনা আসলে বৌদ্ধদের দাবি নস্যাৎ করে হিন্দু প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা। কিন্তু বুদ্ধ অনুরাগী রবীন্দ্রনাথ কি ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেননি। দু'জনের তর্কবিতর্ক হয়। এর বিবরণ কেউ লিপিবদ্ধ করে রাখেননি। ১৫ অক্টোবর নিবেদিতা লিখেছেন, 'আমরা কথা বলছিলাম ইতিহাস, জাতীয়তা, স্বামীজি, শ্রীরামকৃষ্ণ এবং অন্যান্যদের নিয়ে'।

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ডায়ারি থেকে নিবেদিতা-রবীন্দ্রনাথের তর্কবিতর্কের আভাস পাওয়া যায়। স্মরণীয়, ১৫ অক্টোবর তারিখে নিবেদিতা মিস ম্যাকালাউডকে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যা লিখেছিলেন। তিনি আমার দেখা একমাত্র ভারতীয় যাঁর ভিতর সামাজিকভাবে নষ্ট হয়ে যাওয়া শিশুর মতো কিছু নেই। তাঁর কথাবার্তার ভিতর একটা সরল নিষ্পাপ অহংকার আছে, যা এত শিশুসুলভ যে মর্মস্পর্শী।' রবীন্দ্রনাথ-নিবেদিতার মেঘ-রৌদ্র সম্পর্ক প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের কথা এসে পড়ে। 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে আছে, রবীন্দ্রনাথ নাকি বলেছিলেন, 'বিবেকানন্দ কি বিবেকানন্দ হতেন, যদি না নিবেদিতার আত্মনিবেদন লাভ করতেন।' আবার এমন কথাও বলে বসেন, 'ভগিনী নিবেদিতা বিবেকানন্দের শিষ্যা হইয়া কুশিক্ষাগ্রস্ত হইয়াছেন।' শেষোক্ত মন্তব্যটি যদি সত্যি হয়, তাহলে নিবেদিতা এমন কিছু নিশ্চয়ই করেছিলেন যা রবীন্দ্রনাথ পছন্দ করতে পারেননি।

শিলাইদহের অভিজ্ঞতা নিবেদিতার কাছে মধুর ছিল না। এমন কী ঘটেছিল যে কবির প্রতি তীব্র বিদ্বেষ ও ক্ষোভ নিয়ে বাগবাজারে ফিরে এসেছিলেন? পিয়র্সন গোরা ও নিবেদিতার সম্পর্ক বিষয়ে কবির কাছে জানতে চাইলে কবি চিঠিতে জানান, তিনি আসলে গোরার গল্পটা নিবেদিতাকে বলেছিলেন তাঁর মনের ভিতরে গভীরভাবে প্রোথিত করে দেওয়ার জন্য। কী প্রোথিত করে দেওয়ার জন্য? নিবেদিতা ভারতকে আপন ভাবলেও ভারত তাঁকে গ্রহণ করবে না? রবীন্দ্রনাথের কাছে নিবেদিতার কোনও স্বীকৃতি নেই? এই রবীন্দ্রনাথকে যেন আমরা চিনি না।... এরপর প্রায় সাড়ে ছ'বছর নিবেদিতা বাঁচবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বা নিবেদিতা কেউ পরস্পর ঘনিষ্ঠ হওয়ার আগ্রহ দেখাবেন না।

১৪ নভেম্বর ১৯১৩, শান্তিনিকেতন। কবির হাতে একটি টেলিগ্রাম এসে পৌঁছল। তাঁকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হচ্ছে। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে এটা সেরা ঘটনা। আর এর কয়েক ঘণ্টা আগে এডওয়ার্ড জন টমসনের সঙ্গে আলাপচারিতায় কবি নিবেদিতা সম্পর্কে নিজের মনোভাব জানাচ্ছেন। জানাচ্ছেন, 'আমি তাঁকে পছন্দ করতাম না। তিনি ভীষণ উগ্র ছিলেন। আমার এবং আমার কাজের প্রতি তাঁর তীব্র ঘৃণা ছিল, বিশেষ করে এখানে, এবং আমার বিরুদ্ধে যা কিছু করা যায় তিনি সব করেছিলেন। তিনি খুব আত্মবিশ্বাসী ছিলেন যে আমি দেশাত্মবোধহীন' ইত্যাদি। টমসন জানতে চান, বাংলায় উগ্র রাজনীতির পৃষ্ঠপোষকতা করে নিবেদিতা বহু মানুষের রক্তস্রোত ঘটানোর জন্য দায়ী কি না। কবির তাতে জোরালো উত্তর, ইয়েস, শি ইউসড টু সে মোস্ট রং অ্যান্ড ফোলিস থিংস'। এডওয়ার্ডের মতো আমাদেরও বিস্ময়, তাহলে রবীন্দ্রনাথ কেন নিবেদিতাকে প্রশস্তি করে 'ভগিনী নিবেদিতা' লিখলেন। উত্তর দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ভারতের প্রতি তাঁর ভালোবাসা, সেবা রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল। তাই তিনি লিখেছিলেন।

১৩ অক্টোবর ১৯১১। দার্জিলিংয়ে দেহাবসান হয় নিবেদিতার। জগদীশচন্দ্রের অনুরোধে কবি 'ভগিনী নিবেদিতা' প্রবন্ধটি লেখেন। 'প্রবাসী' পত্রিকায় ১৩১৮ অগ্রহায়ণ এটি প্রকাশিত হয়। তাতে আছে, 'যেখানে তাঁহাকে মানিয়া চলা অসম্ভব সেখানে তাঁহার সঙ্গে আমার মিলনের নানা অবকাশ ঘটিলেও একজায়গায় অন্তরের মধ্যে আমি গভীর বাধা অনুভব করিতাম। সে যে ঠিক মতের অনৈক্যের বাধা তাহা নহে, সে যেন একটা বলবান আক্রমণের বাধা।' আর নিজের মৃত্যুর মাত্র আড়াই মাস আগে (২৩ মে ১৯৪১) রানি চন্দের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জানাচ্ছেন, 'নিবেদিতা এই দেশকে এই দেশের লোককে সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালোবেসেছিলেন। তাঁর ভালোবাসা যে কত সত্যিকারের তা বলবার নয়। সবকিছু ঢেলে দিয়েছিলেন। তাঁর এই সাহস, এত আত্মত্যাগ অবাক করে দিয়েছিল আমাকে। তাই বলা যায় 'গোরা' উপন্যাসকে 'ঢেলে সাজানো'র জন্য নিবেদিতার জেদ এবং রবীন্দ্রনাথের নিবেদিতার প্রতি শ্রদ্ধাও অনুঘটকের ভূমিকা নিয়েছিল বলা যায়।

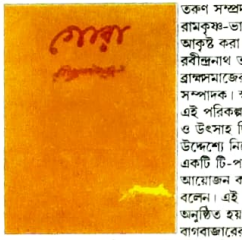

ঋণ: নায়কের সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ/ জ্যোতির্ময় ঘোষ। নিবেদিতা/ লিজেল রেমঁ (অনুবাদ: নারায়ণী দেবী)। নিবেদিতা এক পরিক্রমণ/ দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত। ভগিনী নিবেদিতা/ প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা। ভগিনী নিবেদিতা/ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অশ্লীলতার দায়ে বিনয়কে কবিতা পড়তে দেওয়া হয়নি

পঙ্কজ বিশ্বাস

প্রাণাধিক' তুমি লেখো, লেখো, শুধু লেখো।' একাত্তর বছর বয়সি কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ যাকে অ্যাড্রেস করে এই কথা লিখছেন, সে তখন তেরো-চোদ্দো বছর বয়সের হাফপ্যান্ট পরা বালক। এই বালকই কবিতা লিখে একদিন জয়ী হবেন। তাঁর জীবন নিয়ে গসিপ হবে, জন্ম নেবে মিথ। 'লার্জার দ্যান লাইফ' হতে হতে সিলভার স্ক্রিনের নায়ককেও তিনি ছাপিয়ে উঠবেন। দা ট্রি ইজ রিকগনিজেবল ইন ইটস জারমিনেশন স্টেজ। সেদিনের সেই বর্ষীয়ান মানুষটি নিশ্চয়ই এই কথা উপলব্ধি করেছিলেন। আমরা জানি, এই কবিতা লেখার জন্য তাঁর স্নেহের পাত্রটিকে মাশুলও কম দিতে হবে না। অপ্রাপ্তি-অবহেলা-ধিক্কার তাঁর জীবনকে শূন্য থেকে আরও শূন্যতার দিকে নিয়ে যাবে। লিখবেন, 'আমিই গণিতের শূন্য'। আবার কখনও সব হারানোর অহংকার ফুটে উঠবে তাঁর 'কবিতার শহীদ'-এর মতো সিগনেচারে।

স্মৃতিকথায় বিনয় মজুমদার জানিয়েছেন, বার্মার তোডো শহরে তাঁর জন্ম। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের ১৭ সেপ্টেম্বর। তবে আদি নিবাস অবিভক্ত বাংলার গোপালগঞ্জ মহকুমার তাড়াইল গ্রাম, থানার নাম টেঙরাখোলা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান দক্ষিণ বার্মা দখল নিলে, বিনয়ের পিতা বিপিনবিহারী মজুমদার অনেক ধকল সয়ে সপরিবারে নিজের গাঁয়ে ফেরেন। বিনয়কে প্রথমে বাড়ির পাঠশালায় ভর্তি করে দেওয়া হয়। এরপর ১৯৪৬ সালে বৌলতলি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে। এখানেই বিনয়ের কবিতা লেখার প্রথম অঙ্কুরোদগম। সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হবে বলে লেখা জমা দেওয়ার জন্য স্কুলে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। "আমিও কাগজ কলম নিয়ে বসে গেলাম। কবিতা লেখার চেষ্টা করলাম। এবং একটি কবিতা লিখলাম। ... এই কবিতাটিই আমার রচিত প্রথম কবিতা।" এমনটাই বিনয় জানিয়েছেন। অবশ্য সেই কবিতা পাওয়া যায়নি।

১৯৪৮-এর ডিসেম্বরে দেশভাগের কারণে বিপিনবাবুকে পরিবার নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবাংলা তথা ভারতে চলে আসতে হয়। কিছুদিন ছিন্নমূল হয়ে থাকার পর বনগাঁ মহকুমার শিমুলপুর গ্রামে বারো বিঘা জমি কিনে স্থায়ী বসতভিটে স্থাপন করেন। বিনয়ের মায়ের নামে নামাঙ্কিত হয় 'বিনোদিনী কুঠি'।

১৯৫৮ সালে বিনয় 'অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব হাইজিন অ্যান্ড পাবলিক হেলথ'-এ অধ্যাপনার চাকরি পান। অফিস ছিল কলকাতার ১১০, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউতে। ওই সময় কফি হাউসে যাতায়াত সূত্রে নতুন করে সেদিনের সেই কিশোরীকে দেখছেন। দেখে মুগ্ধ হচ্ছেন। না বলা বাণী-র বেদনা কবিতা হয়ে জন্ম নিচ্ছে। এই নারী হলেন এখনকার স্বনামধন্য অধ্যাপক, তাত্ত্বিক গায়ত্রী স্পিভাক চক্রবর্তী।

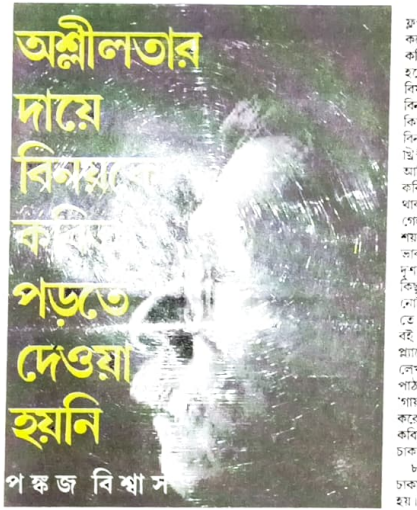

ছেলেদের অবশ্য রেখে দেন কলকাতার হস্টেল, মেসে। বিনয়কে ভর্তি করে দেওয়া হয় মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিশন (স্কুল)-এ। অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হলেও সেশনের মাঝখানেই বিনয় জেদ করে নবম শ্রেণিতে ভর্তি হন। এই স্কুল জীবনেই বন্ধুদের সঙ্গে কলকাতা শহর পায়ে হেঁটে চষে বেড়িয়েছেন। কলকাতার বিভিন্ন লাইব্রেরি তাঁর গোগ্রাসি পাঠক্ষুধার তৃপ্তি দিয়েছে। স্কুলের পত্রিকার জন্য একটি কবিতা লিখেছিলেন এই সময়। পত্রিকাটি আর বেরোয়নি। বিনয় সেই কবিতার একটি চরণই শুধু স্মরণ করতে পেরেছেন। "ভিজে ভারী হল বেপথু যূথীর পুষ্পসার।" ভাগ্যদেবতা সেদিন বোধহয় মুচকি হেসেছিলেন!

ম্যাট্রিকুলেশনে উত্তীর্ণ হয়ে বিনয় ইন্টার মিডিয়েটে প্রেসিডেন্সি কলেজে সায়েন্স নিয়ে ভর্তি হন। গণিতে লেটার মার্কস পাওয়াই তাঁর কাল। না হলে তো আর্টস নিয়েই তাঁর পড়ার ইচ্ছে ছিল। বাড়ির চাপে তা পারেননি। এই সময় বিনয় ইডেন হিন্দু হস্টেলে থাকতে শুরু করেন। এখানকার দু'বছরের হস্টেল লাইফ খুব তাৎপর্যপূর্ণ। বিনয় এই সময় চুটিয়ে কবিতা লিখছেন। সহপাঠীরা যেন জানতে না পারেন, সতর্ক থেকেছেন। অবশ্য চাপা থাকেনি। হস্টেলের নোটিশ বোর্ডে তাঁর রঙ্গ কবিতাগুলির সঙ্গে অলঙ্করণ হিসাবে তিনি ব্যঙ্গচিত্রও জুড়ে দিতেন। ছবি আঁকার প্রতি তাঁর মোহ আজীবন ছিল। ভালো অভিনয়ও করতেন। বিনয় জানিয়েছেন, এখানে তাঁর রুমমেট ছিলেন সত্যব্রত চৌধুরী, যিনি ময়মনসিংহের জমিদারের ছেলে। ইনিই তাঁকে মাঝে মাঝে 'বারোমাস' পত্রিকার সম্পাদক কবি বিমল ঘোষের কাছে নিয়ে যেতেন। বিনয় নিজের কবিতার খাতা তাঁর কাছে রেখে আসতেন। এই খাতা থেকে বেছে বেছে বিমলবাবু কিছু কবিতা পত্রিকায় ছাপিয়েছেন। এটা ১৯৫১-৫২ সালের ঘটনা। এই সময় সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরীর সঙ্গেও বিনয়ের সখ্য গড়ে ওঠে।

আর ঠিক এই সময়েই গায়ত্রী উপাখ্যানের জন্ম। "আমি যখন ইডেন হিন্দু হস্টেলে ছিলাম, তখন গায়ত্রীর বাবা ছিলেন সুপারিন্টেন্ডেন্ট জনার্দ্দন চক্রবর্তী, দাদার নাম প্রসূন চক্রবর্তী। তখন ওর বয়স বছর ১২। তখন থেকে দেখছি। পুরোহিতের মেয়ে তো। বেশি কথাবার্তা হয়নি। আলাপ-আলোচনা হত। কবিতা নিয়ে। কবিতা লিখেছি কবে, দু'জনে চকিতে চেতনায় এবার বুঝলে তো!" যদিও বিনয় এই রিলেশনের ব্যাপারে কখনও সদুত্তর দেননি। হেঁয়ালি করেছেন। ১৯৫৩-তে বিনয় শিবপুর বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ও স্পেশাল সাবজেক্ট প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হন। বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। রুশ ভাষা শেখেন। ফাইনাল পরীক্ষার আগে অনুবাদের কাজ করে যেতে থাকেন এবং ১৯৫৭-তে বিই-তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট বা সেকেন্ড হয়ে পাশ করেন। ১৯৫৮ সালে বিনয় 'অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব হাইজিন অ্যান্ড পাবলিক হেলথ'-এ অধ্যাপনার চাকরি পান। এর অফিস ছিল কলকাতার ১১০, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউতে। এই সময় কফি হাউসে যাতায়াত সূত্রে নতুন করে সেদিনের সেই কিশোরীকে দেখছেন। দেখে মুগ্ধ হচ্ছেন। না বলা বাণী-র বেদনা কবিতা হয়ে জন্ম নিচ্ছে। এই নারী হলেন এখনকার স্বনামধন্য অধ্যাপক, তাত্ত্বিক গায়ত্রী স্পিভাক চক্রবর্তী।

বিনয়ের প্রথম কবিতার বই 'নক্ষত্রের আলোয়'। বইটির প্রকাশ ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে। কবিতাগুলি জুতসই হয়নি। জীবনানন্দের প্রভাব আছে। যে কারণে বইটি 'সুপার ফ্লপ' হয়। তবে এই বই প্রকাশ করেই বিনয়ের একটা শিক্ষা হয়। কবিতার জন্য তাঁকে প্রস্তুত হতে হবে, উপলব্ধি করেন। সখ্য হয় বিষ্ণু দে-র সঙ্গে। 'সাহিত্যপত্র'-তে বিনয়ের কয়েকটি কবিতাও ছাপেন। কিন্তু তৃপ্ত হতে পারছেন না বিনয়। বিনয় জানাচ্ছেন, "এরপর ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের একেবারে গোড়ার দিকে আমি স্থির করলাম সর্বান্তকরণে কবিতাই লিখি। চাকুরি আপাতত থাক। গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় চলে গেলাম। সকালে জাগরণ থেকে শয়ন পর্যন্ত সারাক্ষণ কবিতাই ভাবতাম। আশেপাশে শহরের যে দৃশ্যাবলী দেখতাম তার কোনো কিছু কাব্যিক মনে হলে তখনি নোটবুকে টুকে রাখতাম।" ১৯৬১-তে প্রকাশিত হল দ্বিতীয় কবিতার বই 'গায়ত্রীকে'। দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টে চাকরির সময় কবিতাগুলি লেখা। ছোট্ট কলেবর হলেও কবিতা পাঠকদের দৃষ্টি এড়াল না। 'গায়ত্রীকে' পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত করে ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে বাংলা কবিতার মাইলস্টোন 'ফিরে এসো, চাকা' নামে প্রকাশ।

৮ মার্চ ১৯৬০। 'ফিরে এসো, চাকা' বইয়ের প্রথম কবিতা লেখা হয়। বিনয়ের মানসিক অসুস্থতার লক্ষণ এই সময়েই প্রথম দেখা যায়। ১৯৬১-তে তাঁকে ভর্তি করা হয় মানসিক হাসপাতালে। এই সময়ের অনেক ঘটনার কথা বিভিন্নজনের লেখায়, স্মৃতিচারণায় জানা যায়। কখনও কফি হাউসের বয়কে চড় মেরে ধরাশায়ী করা, তাঁর তিন বইয়ের প্রকাশক, ব্যক্তিগত বন্ধু দেবকুমার বসুকে হাতে আঁকা নিজের আমূল লিঙ্গের ছবি পাঠিয়ে দেওয়া, এইরকম ঘটনা। একবার কফি হাউসে তাঁর নির্দিষ্ট টেবিলে এক মহিলাকে বসতে দেখে এমন অশান্তি করেন যে, হই চই বেধে যায়। চাকরি জীবনে বিনয় স্থিত হতে পারেননি। এমনকী জাপান থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং, লন্ডন থেকে গণিতের অধ্যাপক হিসাবে আমন্ত্রণ এলেও তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। যদিও পরবর্তীকালে এই নিয়ে তাঁর অনেক আক্ষেপ ছিল। তাঁর এই এলোমেলো জীবনের জন্য অনেকটাই দায়ী, অনুমান করতে বাধা নেই প্রত্যাখ্যাত প্রেম। কবিতায় আছে, "প্রত্যাখ্যাত প্রেম আজ অসহ ধিক্কারে আত্মলীন। / অগ্নি উদবমন ক'রে এ গহ্বরে ধীরে ধীরে তার / চারিপাশে বর্তমান প্রাচীর তুলেছে।"

'৬২ সালে শক্তি চট্টোপাধ্যায় 'সম্প্রতি' পত্রিকায় 'ফিরে এসো, চাকা' গ্রন্থের সমালোচনা লিখলে পাঠকদের মধ্যে আলোড়ন পড়ে যায়। এই সময়ই বিনয় বিভিন্ন পত্রিকা থেকে কবিতা লেখার আমন্ত্রণ পাচ্ছেন, বিভিন্ন সভায় কবিতা পাঠের আমন্ত্রণ পাচ্ছেন, অনেক কবি বন্ধুও জুটে যাচ্ছে। কৃত্তিবাসের বিশতম সংখ্যায় প্রকাশ পাচ্ছে জ্যোতির্ময় দত্তের 'বিনয় মজুমদার: কবিতার শহীদ'। এই জ্যোতির্ময় দত্ত যিনি বুদ্ধদেব বসুর জামাতা, বিনয়কে তাঁর নিজের বাড়িতে আশ্রয়ও দিয়েছেন। তাঁর বাড়িতে বসেই বিনয় প্রকাশ করছেন 'আমার ঈশ্বরীকে', ১৯৬৪-তে। বইটি পাঠকের আদর পায়নি। এরপর ১৯৬৫-তে 'অধিকন্তু', ১৯৭৩-৭৪-এ 'অঘ্রাণের অনুভূতিমালা' প্রকাশ পেল। আর ১৯৭৬-এ 'বাল্মীকির প্রতিভা'। প্রকাশ মাত্রই পাঠক মহলে ঝড় ওঠে। অশ্লীলতার দায়ে কবি অভিযুক্ত হন। এমনকী ঘটনা থানা পর্যন্ত গড়িয়েছিল। কবি নিজেও বইটি সম্পর্কে লজ্জিত হয়েছেন। শোনা যায়, গোর্কি সদনে অশ্লীলতার দায়ে বিনয়কে কবিতা পড়তে দেওয়া হয়নি। এরপর বিনয়ের আর কোনও বই প্রতিষ্ঠিত প্রকাশনালয় থেকে বেরোয়নি (শ্রেষ্ঠ কবিতা ব্যতীত)। তাঁর বিখ্যাত কবি বন্ধুরাও উদ্যোগী হননি। 'ওয়ান বুক অয়ান্ডার' বলে তাঁর চৌহদ্দি এঁকে দেওয়া হয়। তারপরেও তাঁর ভক্তরা অনেকগুলি কবিতার বই বিভিন্ন সময় উদ্যোগী হয়ে প্রকাশ করেছেন। যেমন 'আমাদের বাগানে', 'আমাকেও মনে রেখো', 'হাসপাতালে লেখা কবিতাগুচ্ছ', 'শিমুলপুরে লেখা কবিতা', 'একা একা কথা বলি'। তবে তাঁর খ্যাতির প্রধান জায়গাজুড়ে রয়েছে 'ফিরে এসো, চাকা'। 'দেশ' পত্রিকায় সনাতন পাঠকের কলামে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'একটি অসাধারণ কবিতার বই' নামের সমালোচনায় লিখেছেন, "বিনয় মজুমদারের মতন কবি পৃথিবীর যে-কোনও দেশেই দুর্লভ। বাংলাদেশ কবিতার দেশ, এটা নিতান্তই ছেঁদো কথা, যদি সত্যিই তাই হতো, তা হলে বিনয় মজুমদারকে বাংলাদেশের মাথায় করে রাখা উচিত ছিল।"

মাত্র ২৯ বছর বয়সে বানপ্রস্থ নেওয়া এই জীবনের পরবর্তী অধ্যায় খুব করুণ। বন্ধুবান্ধব, শুভানুধ্যায়ী কিংবা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি একইসঙ্গে চলেছে আত্মীয়দের অবজ্ঞা, মনের বিরুদ্ধে গিয়ে তাঁর যন্ত্রণাদায়ক চিকিৎসা ব্যবস্থা, স্বার্থান্বেষী মানুষের ভিড় কিংবা স্থানীয় মানুষের তাঁকে ঘিরে নানা উপদ্রব। সবই তাঁকে সয়ে যেতে হয়েছে। অনেক অভিমান, ক্ষোভ জন্মেছিল মনের মধ্যে। ঠোঁট নাড়তেন সুধীন্দ্রনাথ উচ্চারণ করে, 'সহে না সহে না আর, জনতার জঘন্য মিতালি'। ১৯৯৫ সালে 'কবিতীর্থ' সম্মানই বিনয়ের পাওয়া প্রথম পুরস্কার। এরপর ডিভিসি-র 'সুধীন্দ্রনাথ স্মৃতি পুরস্কার', 'কৃত্তিবাস পুরস্কার', 'রবীন্দ্র পুরস্কার', 'হাসপাতালে লেখা কবিতাগুচ্ছ'-র জন্য 'অ্যাকাডেমি পুরস্কার' পান। কোনওটাই নিতে কলকাতায় যেতে রাজি হননি। সকলে বাড়িতে এসে মানপত্র, স্মারক দিয়ে গিয়েছেন। রবীন্দ্র পুরস্কার পাওয়ার খবর পেলে বিনয় নাকি দরজা বন্ধ করে নগ্ন হয়ে খাটে শুয়েছিলেন!

তবে এইসব ছাপিয়ে যা ছিল, তা তাঁর হৃদয়ের অতলান্ত বিরহ। ২০০৪ সালে বিদুষী গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক কলকাতা শহরে এসেছেন। টেলিভিশনে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বিনয় মজুমদার 'বাংলার দান্তে' বলে প্রশংসা করেছেন।

সাতের পাতায়

যুগশঙ্খ
রবিবারের বৈঠক
রবিবার ২০ সেপ্টেম্বর ২০২০

পল্লবে সজ্জিত তাঁর গুরু শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ছবিটি ছিল। 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় ছবিটি প্রকাশিত হয় (১৩৩২ বঙ্গাব্দ)।

অশ্লীলতার দায়ে বিনয়কে কবিতা পড়তে দেওয়া হয়নি

ছয়ের পাতার পর

আনন্দবাজার পত্রিকার 'কলকাতার কড়চা'-য় ছবি সমেত তা বেরোয়। যেন এই স্বীকৃতির অপেক্ষাতেই তিনি এতদিন ছিলেন। এতে খুব আনন্দ পান বিনয়।

'হাসপাতালে লেখা কবিতাগুচ্ছ'-এর 'আমরা দুজনে মিলে' বিনয় লিখলেন, "আমার ঠিকানা আছে তোমার বাড়িতে,/ তোমার ঠিকানা আছে আমার বাড়িতে,/ চিঠি লিখব না।/ আমরা একত্র আছি বইয়ের পাতায়।"

১১ ডিসেম্বর ২০০৬। শীতের কুয়াশা মুছে সূর্যের নরম আলোয় ভরে উঠেছে বিনোদিনী কুঠি। ধীরে ধীরে চোখের পাতা নেমে এল কবির। "ঠোঁটে... আমি ফের জন্মাব। ...মানুষেরা গাছেরও বিয়ে দেয় অথচ আমাকে বিয়ে দিল না মানুষেরা... মাধু পরের জন্মে তুমি আমার মেয়ে হয়ে এসো তোমাকে দোলনা কিনে দেব ভালো করে সাজাবো...। যাকে 'সাকসেস' বলি, সেই সিঁড়িতে ওঠার সব প্রতিভাই তাঁর ছিল। পারিপার্শ্বিকতা তো অবশ্যই, সঙ্গে 'নিজেরই মুদ্রাদোষে' তিনি জীবনের ঘূর্ণিতে পথ হারিয়ে ফেললেন। জীবনের অঙ্কে ফেল হলেন। আবার জন্মগ্রহণ করে সেই অঙ্ক তিনি মিলিয়ে নেবেন একজন ম্যাথমেটিশিয়ানের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে এর পার্থক্য থাকে কি।

গ্রন্থঋণ: 'বিনয় মজুমদারের ডায়েরি' (শিলীন্ধ্র প্রকাশন), অমলকুমার মণ্ডল: 'অশ্বিনী তারার কবি বিনয় মজুমদারের জীবনকথা' (কবিতীর্থ), বিনয় মজুমদার: 'ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য' (প্রতিভাস)

...তে ভুলবেন না। ঠিকানা: rabibarerboithak@gmail.com

আপনার অভিমত

অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য যোজনা আছে, চেতনা নেই

পঙ্কজ বিশ্বাস

[illegible] ... Unorganized Workers Social Security Act, 2008 ... [illegible] "home based worker or a self employed worker or a wage worker in the unorganized sector and includes a worker in the organized sector who is not covered by any of the Acts pertaining to welfare Schemes." [illegible]

[illegible]

আপনার অভিমত

স্কুলব্যাগের ভার কমলেও প্রত্যাশার বোঝা কমবে কি?

রাষ্ট্রের সদিচ্ছা থাকলে প্রথম ক্ষেত্রে হয়তো কিছু পরিবর্তন আসতে পারে। কিন্তু অভিভাবকদের বেলায়? তাঁরা কি স্কুলের পাঠদানে সন্তুষ্ট থাকতে পারবেন? লিখলেন

পঙ্কজ বিশ্বাস

যদি-বা দেখি আমার পাশে/ কেউ দুঃখে কাঁদছে বসে/ তার চক্ষের জল মোছাতে/ পারব না কি বড়ো বয়সে?— সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কবে যে আমি বড়ো হব' কবিতার শিশুটির বিভিন্ন স্বপ্নের মধ্যে এই রকম একটা স্বপ্নও ছিল। কিন্তু বাস্তবে এই শিশুদেরই 'চক্ষের জল' মোছায় কে! বহুদিন ধরেই একটা বিষয় বার বার আলোচনার শিরোনামে উঠে এসেছে। শিক্ষার নামে শৈশবকে হত্যা করা হচ্ছে। যার প্রভাব পড়ছে তাদের ব্যক্তিত্ব গঠনে। অপরিকল্পিত সিলেবাস, শিক্ষা পদ্ধতি, বই-খাতার বহরে খুদে শিক্ষার্থীরা সত্যিই নাজেহাল। এর উপর যদি আবার অভিভাবকদের প্রত্যাশা যোগ হয়, তা হলে তো আর কথাই নেই।

যাই হোক, অবশেষে রাষ্ট্রই এই ব্যাপারে ত্রাতার ভূমিকা নিল। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রক নির্দেশ জারি করেছে— প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে কোনও 'হোমওয়ার্ক' দেওয়া যাবে না। বাড়ি থেকে তৈরি করা পাঠের কাজও দেওয়া যাবে না। একই সঙ্গে শ্রেণি অনুযায়ী ব্যাগের ওজন সীমাও বেঁধে দিয়েছে সরকার। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ব্যাগের ওজন সর্বাধিক দেড় কিলোগ্রাম হতে পারে। পাঠ্য বিষয়ও গণিত ও ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ। দেশের সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এই একই নিয়ম বলবৎ হবে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়বে মাস ছয়েক আগে মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতির এই বিষয়ে নির্দেশ জারির কথা।

নিঃসন্দেহে এটি একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। কিন্তু বলতে ইচ্ছে করে 'বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে?' কারণ, গলদটি তো একেবারে গোড়ায়। একদিকে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা বিভিন্ন বেসরকারি স্কুল ও তার 'চমকপ্রদ' শিক্ষা পদ্ধতি। অন্যদিকে, অভিভাবকদের প্রত্যাশার পারদ। রাষ্ট্রের সদিচ্ছা থাকলে প্রথম ক্ষেত্রে হয়তো কিছু পরিবর্তন আসতে পারে। কিন্তু অভিভাবকদের বেলায়? তাঁরা কি স্কুলের পাঠদানে সন্তুষ্ট থাকতে পারবেন? বিশ্বাস করতে পারবেন স্কুলের পাঠের উপর? কিংবা মানতে পারবেন সন্তানের 'নিজের মতো' করে সময় কাটানোর ব্যাপারে? বরং এর পর শিশুর বিকেলটুকু 'হরণ' করবেন প্রাইভেট টিউটর রেখে। নিজেদের সুপ্ত ইচ্ছের বোঝা খুদে শিশুকে কেন মাথায় তুলে নিতে হবে? এর উত্তর নেই।

আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার জনক রুশো শিশুকে 'নেতিবাচক শিক্ষা' দেওয়ার কথা বলেছিলেন। যেখানে শিশুকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। শিশু তার অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়েই শিক্ষা অর্জন করবে। রুশোর মত নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। কিন্তু শিশুর স্বাধীনতাকে 'মর্যাদা' দেওয়াটা কিন্তু কাজের কথাই। আমাদের অভিভাবকদের শিক্ষার মোদ্দা কথাটাই তো মাথায় ঢোকে না। তাঁরা কিছুতেই বুঝতে চান না শিশুর অন্তর্নিহিত সুপ্ত সম্ভাবনাগুলিকে প্রস্ফুটিত করাই শিক্ষার লক্ষ্য। বুঝতে চান না অন্য কোনও শিশুর মতো তাঁর সন্তান অঙ্কে একশোয় একশো না পেলেও ভাল আঁকতে জানে। সে যদি ইংরাজি ভাল না পারে, তা হলে কি শিক্ষাদানের পদ্ধতিগত ত্রুটির কথাও একটু ভেবে দেখব না! আর তার ক্ষমতাও তো 'অতিকায়' নয়। বরং তার স্বাস্থ্যের দিকে একটু নজর দেওয়া হোক। বিকালে বইয়ে মুখ না গুজে বসিয়ে না দিয়ে বরং ছেড়ে দেওয়া যাক আর পাঁচটা শিশুর সঙ্গে খেলার মাঠে। তার সন্তান বড় হয়ে একক বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন করবে না। তাকে সামাজিক করে তোলার জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি প্রয়োজন।

"By education I mean an all round drawing out of the best in child and man— body, mind and soul. Real education consists in drawing the best out of yourself."— শিক্ষা সম্পর্কে গাঁধীজির এই রকম ভাবনা ছিল। কিন্তু সন্তানদের শিক্ষার ব্যাপারে অভিভাবদের চিন্তা এই খাতে বয় না।

কাজেই সমস্যার শেষ নেই!

আর আজকালকার 'নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি'তে পিতা-মাতা যদি ওয়ার্কিং পেরেন্টস হন, তা হলে সেই পরিবারের শিশুর যন্ত্রণা নিরসনের উপায় কী, ভেবে পাওয়া যায় না। দিনের শেষে মায়ের দেওয়া চকোলেট কি শিশুর একাকীত্বের উপশম হতে পারে! আর কে না জানেন, শিশুর প্রথম বিদ্যালয় তার গৃহই। আসল কথাটি বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি তাঁর 'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ' প্রবন্ধে লিখেছেন— "শিক্ষা সম্বন্ধে সব চেয়ে স্বীকৃত এবং সব চেয়ে উপেক্ষিত কথাটা এই যে, শিক্ষা জিনিসটি জৈব, ওটা যান্ত্রিক নয়। এর সম্বন্ধে কার্যপ্রণালীর প্রসঙ্গ পরে আসতে পারে, কিন্তু প্রাণক্রিয়ার প্রসঙ্গ সর্বাগ্রে। ইনকুবেটর যন্ত্রটা সহজ নয় ব'লেই কৌশল এবং অর্থব্যয়ের দিক থেকে তার বিবরণ শুনতে খুব মস্ত; কিন্তু মুর্গির জীবনধর্মানুগত ডিমপাড়াটা সহজ বলেই বেশি কথা জোড়ে না, তবু সেটাই অগ্রগণ্য।"

সেদিন এক পরিচিতার সঙ্গে প্ল্যাটফর্মে দেখা। সঙ্গে তাঁর ছয় বছরের সন্তান। স্কুলড্রেস। কোন স্কুলে পড়ে জানতে চাওয়ায় তিনি গর্বের সঙ্গে কোনও এক নামী স্কুলের কথা জানান। কিন্তু এই রানাঘাট থেকে কৃষ্ণনগর এতটুকু বাচ্চা নিয়ে যাওয়ার কী মানে— বুঝি না। তা-ও আবার এই অফিস টাইমের এই ভিড়ে।

তাই রাষ্ট্রের এই ভাবনা ফলপ্রসূ হবে না, যদি অভিভাবকেরা আন্তরিক ভাবে সচেতন না হন। সন্তানকে ভালবেসে পড়ানো, তার ইচ্ছেকে গুরুত্ব দেওয়া, খেলাধুলো, প্রকৃতির সান্নিধ্য, শিক্ষামূলক ভ্রমণ ইত্যাদির মধ্যে দিয়েই সন্তানের সুষম বিকাশ সম্ভব। মনোবিজ্ঞান বলে, জন্মের সময় প্রতিটি মানবশিশু কতকগুলো সম্ভাবনা নিয়ে জন্মায়। যেগুলিকে আমরা বলে থাকি জন্মসূত্রে পাওয়া বা প্রকৃতিদত্ত সম্ভাবনা। শিক্ষার কাজই হল এই সব সুপ্ত সম্ভবনাকে ও ক্ষমতাকে বিকশিত করা। রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবারের যৌথ ভূমিকাই শিশুর এই বিকাশকে পূর্ণ করতে পারে। "শিশুদিগকে আমার কাছে আসিতে দাও।"— যিশুখ্রিস্ট শিশুদের শ্রদ্ধা করেছেন। তিনিও লক্ষ করেছেন, তাদের মধ্যে পরিপূর্ণতার ব্যঞ্জনা আছে। আমাদের সমাজে অভিভাবকদের কবে ঘুম ভাঙবে!

চাপড়া গভর্নমেন্ট কলেজের শিক্ষক

আপনার অভিমত

কিছু ছাত্রের অভব্যতা গোটা ছাত্রসমাজের দায় হয়ে উঠছে

এই ছাত্রনেতারা পড়াশোনার ধারে-কাছে থাকে না। বছরের পর বছরে এদের ডিগ্রি শেষ হয় না। অথচ কলেজ ক্যাম্পাসে এরাই শেষ কথা। লিখছেন

পঙ্কজ বিশ্বাস

প্রতিদিন ভোরের কাগজে বর্বরতা শব্দ তার সনাতন অভিধার নিত্যনব প্রসারণ খোঁজে।

—শঙ্খ ঘোষ

ফের সেই চেনা ঘটনা। ফের সেই শান্তিপুর কলেজ। এ বারের অভিযোগ কলেজে ঢুকে দুই শিক্ষককে নিগ্রহ-মারধর ও আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে হুমকির। যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তারা এই প্রতিষ্ঠানেরই বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র। আগেও এই ধরনের ন্যক্কারজনক ঘটনার জন্য তারা সংবাদপত্রের শিরোনামে এসেছে।

বিভিন্ন ভাবে ছাত্রদের হাতে আজকাল শিক্ষক সমাজ নিগৃহীত হচ্ছে। কোথাও অন্যায্য দাবিতে শিক্ষকদের ঘেরাও করা, কারণে-অকারণে অবস্থান-বিক্ষোভ, কোথাও আবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে চলেছে। অতীতেও ছাত্রদের হাতে শিক্ষক সমাজ নিগৃহীত হয়েছে। মনে পড়বে মাজদিয়া কলেজের অধ্যক্ষ নিগ্রহের ঘটনার কথা। কিংবা বছর কয়েক আগে দক্ষিণ কলকাতার একটি কলেজের ঘটনা। আর একথা অস্বীকার করার জায়গাও নেই যে এই ধরনের ঘটনা কলেজগুলিতে প্রায়ই ঘটে। কিন্তু সব সময়ে তা মিডিয়ার আলো পায় না। বরং এগুলি আজকাল এত পরিচিত যে আমাদের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু অন্ধ হলে প্রলয় কখনও বন্ধ থাকে না। শিক্ষকদের উপরে আক্রমণ এবং তা শিক্ষাঙ্গনের মধ্যেই, এটা সমাজের উপরেই আঘাত। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্কের প্রাথমিক ভিতই (শ্রদ্ধা-স্নেহ) তো এতে নড়বড়ে হয়ে যায়। এই সব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অভিজ্ঞতার পরে শিক্ষক সমাজ সেই উৎসাহ নিয়ে কি আর শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মিশতে পারবেন? কিংবা পাঠদান করতে পারবেন? আর সেই নিগৃহীত শিক্ষকও তো সামাজিক মানুষ। তাঁরও পরিবার আছে। এই আঘাত ও অপমান কি তিনি ভুলে থাকতে পারবেন?

শুধু তা-ই নয়। মিডিয়ার দৌলতে এই সব ঘটনা গোটা সমাজকে প্রভাবিত করে। রাষ্ট্রের হাতেই কিন্তু এর সমাধান আছে— আইনি ব্যবস্থা নেওয়া। কিন্তু বাস্তবে আমরা ঠিক এর উল্টো ছবি দেখতেই অভ্যস্ত। ভাবনার বিষয়, অপরাধীদের উল্লেখযোগ্য শাস্তি না হওয়ায় আরও অনেক ছাত্র এই দুঃসাহস পেয়ে যায়। আইনের অনুশাসনের প্রতি অনীহা তৈরি হয়। এই ঘটনা এক দিকে যেমন রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি প্রশ্ন তোলে, আবার সমাজের পচনশীল চেহারাও দেখিয়ে দেয়। এ বারের ঘটনা যখন ঘটেছে তখনও যুব দিবস ও নেতাজির জন্মদিবস উদ্‌যাপনের গন্ধ যখন মুছে যায়নি। আর প্রজাতন্ত্র দিবস আসছে। কী বলা যাবে একে!

বলতে দ্বিধা নেই, এর উৎস কিন্তু এই সময়ের রাজনৈতিক সংস্কৃতিই।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনার জন্য একটি কমিটি থাকে। কিন্তু সেই পরিচালন কমিটিগুলির মাথায় প্রায়ই স্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে দেখা যায়। তাঁর যোগ্যতা বলতে তিনি জনপ্রতিনিধি এবং সেই কারণেই প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী। শিক্ষাগত যোগ্যতাকে সেখানে নস্যাৎ করা হয়। ফলে শিক্ষার উন্নয়নের প্রশ্নে তিনি যতটা না মনযোগী, তার চেয়ে তাঁর বেশি মনোযোগ দলীয় স্বার্থকে মূল্য দেওয়ায়। এমন অভিযোগও অহরহ শোনা যায় যে বিরোধী সংগঠনের শিক্ষকদের তাঁরা কারণে-অকারণে হেনস্থা করেন। সেই শিক্ষকদের পিছনে ছাত্র লেলিয়ে দিতেও তাঁর দ্বিধা নেই। আর এদেরই ছত্রচ্ছায়ায় ছাত্র নামধারী দুর্বৃত্তদের বেড়ে ওঠা।

একটু খোঁজ নিলেই জানা যাবে, প্রায় প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই এই ছাত্রনেতারা পড়াশোনার ধারে-কাছে থাকে না। বছরের পর বছর গড়িয়ে গেলেও এদের ডিগ্রি শেষ হয় না। অথচ কলেজ ক্যাম্পাসে এরাই শেষ কথা। তা হলে কলেজের প্রতি এদের কিসের জন্য এত টান? কলেজ পরিকাঠামোর উন্নয়নের জন্য আসা অর্থ, বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য আসা অর্থ, কলেজে ভর্তি হতে আসা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কুপনের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ, ভর্তি করিয়ে দেওয়ার নামে অর্থ, অনার্স পাইয়ে দেওয়ার নামে অর্থ এরা সংগ্রহ করে। এমনকি প্র্যাক্টিক্যালে নম্বর বাড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থাও এদের হাতে আছে, যদি তাদের অর্থের চাহিদা পূরণ করা যায়। রাজনৈতিক নেতাদের কাছে এই চরিত্রগুলি তাই 'সম্পদ'। কেননা এই সংগৃহীত অর্থের কিছু অংশ যেমন পার্টি ফান্ডে জমা পড়ে, জমা হয় নেতার পকেটেও। তার উপরে, ভোট বৈতরণী পার করতেও ছাত্র নেতাদের জুড়ি নেই। কাজেই এই 'ছাত্র'দের অপকর্মকে সেই রাজনৈতিক দলের নেতারা আড়াল করার ক্ষেত্রে উৎসাহী ভূমিকা নেবেন, এটাই স্বাভাবিক। এমনকি 'বাচ্চা ছেলে' বলে সোহাগও দেবেন। আর তাই ছাত্রনেতাদের এতটা আস্পর্ধা। আর এর প্রভাব এসে পড়ছে গোটা ছাত্রসমাজের উপরে।

শিক্ষাব্যবস্থাই সমাজ-ব্যবস্থা ও সামাজিক জীবনধারার বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রাখতে সাহায্য করে। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট নিয়মে অন্য ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আদান-প্রদানমূলক আচরণে অভ্যস্ত হয়। সেই অভিজ্ঞতা গ্রহণের মধ্যে দিয়েই সে বুঝতে পারে কী ভাবে বৃহত্তর সমাজের সদস্যদের সঙ্গে পারস্পরিক আচরণ করতে হবে। সমাজতত্ত্বের ভাষায় এটাই 'সামাজিকীকরণ'। কিন্তু আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের প্রবেশ অশনি সংকেত। লক্ষ করুন, শান্তিপুর কলেজের ঘটনায় আরও অনেক ছাত্র জড়িয়ে রয়েছে। অর্থাৎ সেই পরিচিত উপমার কথাই মনে আসে। একটা পচা আম গোটা ঝুড়ির আমকে পচিয়ে ফেলার পক্ষে যথেষ্ট। কয়েক জন ছাত্রের প্রভাব আরও কয়েকশো ছাত্রকে গোল্লায় যাওয়ার পথে নামিয়েছে। আর কিছু ছাত্রের এই অভব্যতা গোটা ছাত্রসমাজকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে।

জীবনের পূর্ণতার পথে শিক্ষা হল সোপান। শিক্ষাঙ্গন হল সেই সাধনার ভূমি। অতীতে ছাত্র রাজনীতির মধ্যে দিয়ে উঠে আসা অনেক জনদরদি নেতাকে আমরা পেয়েছি। আজকের ছাত্র রাজনীতির মধ্যে থেকে সে রকম কিছু আশা করব, এমন সাহস হয় না। বর্তমান ক্ষমতাসর্বস্ব ভোগবাদী রাজনীতিই এর জন্য দায়ী। 'আমাদের আমলে এতগুলো স্কুল, এতগুলো কলেজ, এতগুলো বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে' বলে কী লাভ, যদি শিক্ষার নামে শিক্ষাঙ্গনে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি চলতেই থাকে?

চাপড়া গভর্নমেন্ট কলেজের শিক্ষক

আপনার অভিমত

‘ঘোটালা’ শব্দের অর্থ এ দেশের শিশুরাও আজ জানে

৯ ডিসেম্বর ছিল দুর্নীতি-বিরোধী দিবস। কিন্তু যে দেশের তৃণমূল স্তর থেকেই রক্ত-মজ্জায় ঢুকে গিয়েছে দুর্নীতি, তার সংস্কার করতে হবে সেখান থেকেই। লিখলেন

পঙ্কজ বিশ্বাস

গতবার প্রতিবেশী একটি কলেজের বার্ষিক পরীক্ষার কেন্দ্র পড়েছিল আমার কলেজে। এক ছাত্রকে নকল করতে দেখে কারণ জানতে চাওয়ায় তার উত্তর— “স্যর, কী করব বলুন! পড়াশোনা করে কী হবে। এখন তো পড়াশোনা করে চাকরি হয় না।” চাকরির জন্য পড়াশোনা জরুরি কিনা— তা আলাদা প্রশ্ন। কিন্তু এই ঘটনা অন্তত এইটুকু বোঝায়, যুবসমাজ দেশের ব্যবস্থাকে এখন কোন চোখে দেখে। তারা এইটুকু বুঝে গিয়েছে কিছু করে খেতে গেলে ‘নীতি’র পথে চললে হবে না। কিছু পেতে গেলে কিছু দিতে হবে।

বাস্তবিকই দেশে এখন ‘কালনেমির লঙ্কাভাগ’ চলছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য থেকে ক্ষুদ্রতম পরিষেবা পর্যন্ত সব আজ দুর্নীতির পাঁকে। দৈনিক সংবাদপত্র, টেলিভিশন থেকে শুরু করে স্যোশাল নেটওয়ার্কিং সাইটে দুর্নীতি বা কোরাপশনেরই কেচ্ছা। মানুষও বোধ হয় আর দুর্নীতি বিষয়ক খবরে এতটুকু উত্তেজিত হয় না। ‘India Corruption Study’ (২০০৫) অনুযায়ী, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল দেখিয়েছে, ৬২ শতাংশ নাগরিক বিশ্বাস করেন ‘Corruption is real and fact’. উইকিপিডিয়া থেকে জানা গেল— ২০১৭ সালে ১৮০টি দেশের মধ্যে দুর্নীতির নিরিখে ভারতের স্থান ৮১।

“দুর্নীতি এক ধরনের পাপ। বিশ্বের প্রতিটি দেশের সরকারই দুর্নীতির নিন্দা করে। কিন্তু তারা নিজেরা দুর্নীতিগ্রস্ত।”— স্যর ফ্রেডেরিক কিথ্ রস্ এই রকম একটি মন্তব্য করেছিলেন। রাজনীতি ও দুর্নীতি এখন সত্যিই সমার্থক হয়ে গিয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে যে দলই দিল্লির মসনদে আসীন হয়েছে, সকলের গায়েই এই দুর্নীতির কলঙ্ক। ভোট কেনাবেচা থেকে শুরু করে বিভিন্ন কেলেঙ্কারিতে বিভিন্ন দল, দলের নেতা-মন্ত্রীদের নাম জড়িয়েছে। ‘স্ক্যাম’, ‘ঘোটালা’ শব্দগুলির অর্থ শিশুরাও আজ জানে।

বিভিন্ন রাজ্যের ক্ষমতাসীন সরকারও এর ব্যতিক্রম নয়। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের গোপন অভিযান থেকে এ কথা আজ জলের মতো পরিষ্কার যে, নেতা-আমলা-মন্ত্রীরা কাউকে বিশেষ সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার বদলে আর্থিক উৎকোচ গ্রহণ করে। সাম্প্রতিক কালে রাফাল কাণ্ড থেকে শুরু করে নীরব মোদীদের টাকা (জনগণের) আত্মসাৎ করে বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় শিল্পপতি বা কর্পোরেট সংস্থাগুলির সঙ্গে কেন্দ্রের শাসকের যোগসাজস খোলসা হয়ে গিয়েছে।

রাষ্ট্রই যেখানে দুর্নীতির প্রশ্নে এতটা ভয়াবহ, সেখানে দেশের আর সকল ক্ষমতাধারীরা কি করতে পারে সহজেই অনুমান করা যায়। এডউইন সাদারল্যান্ড ‘হোয়াইট-কালার ক্রাইম’-এর কথা বলেছিলেন। সমাজের বিত্তশালীদের এই অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে আছে— কর ফাঁকি, বে-আইনি বিক্রয়, শেয়ার ও জমি সংক্রান্ত জালিয়াতি, আত্মসাৎ, ক্ষতিকারক দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রি, বে-আইনি ভাবে পরিবেশ দূষণ। ‘জমি মাফিয়া’, ‘মাটি মাফিয়া’, ‘সিন্ডিকেট’ শব্দগুলির সঙ্গে এই সে দিনও কি আমরা পরিচিত ছিলাম? আর ‘কালো টাকা’ ফেরানোরই বা কী হল? এর কোনও উত্তর নেই।

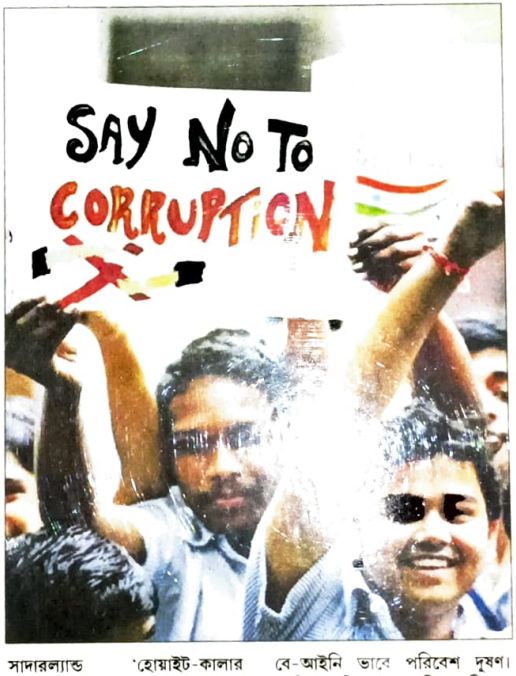

গ্রামে বসবাস করার সুবাদে জানি, ‘ইন্দিরা আবাস যোজনা’র একটা ঘর পেতেও এক জন গরিব মানুষকে পাড়ার ছিঁচকে নেতা বা এলাকার দাদাকে বড় অঙ্কের কমিশন না দিয়ে উপায় থাকে না। সমাজের সর্বস্তরে ইতিহাসের সেই মাৎসন্যায়েরই পুনরাবৃত্তি ঘটে চলেছে। একটা শিশুকে কোনও ভাল স্কুলে ভর্তি করাতে গেলে পর্যন্ত কারি কারি টাকা ডোনেশন দেওয়াই এখন দস্তুর। প্রশ্ন ওঠে, সেই শিশু কি এই ‘গিভ অ্যান্ড টেক’ পলিসি নিজের জীবনেও ভবিষ্যতে প্রয়োগ করবে না?

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় ভিজিলেন্স আয়োগের (CVC) প্রধান এন ভিট্টাল তাঁর ‘Corruption in India: The Road block to National Prosperity’ গ্রন্থে দুর্নীতির কিছু সামাজিক উৎসের কথা বলেছেন। যেমন, পরিবার ও জাতপাত, হিন্দুত্ববাদ, পারিবারিক বন্ধন, ক্ষমতা, ভোগবাদ, পণপ্রথা, বিদ্যালয়ে ভর্তি, জনজীবনে অসততা। ভারতের বর্তমান প্রেক্ষিতে এই প্রত্যেকটি দুর্নীতি কী ভাবে আমাদের দুশ্চিন্তায় রেখেছে, তা নতুন করে কিছু বলার নেই। এই সে দিন এক অনুজ গবেষক বন্ধু আমার কাছে কেঁদে-কেটে পড়েছেন এই বলে যে, তাঁকে তাঁর পিএইচডি গাইড বাড়ির ড্রেন পর্যন্ত পরিষ্কার করান! সমাজ তা হলে আর কোন শ্রেণির মানুষের কাছে মানবিকতা আশা করবে?

গুন্নার মিরদল তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারকে ‘সফট গভর্নমেন্ট’ আখ্যা দিয়েছেন। কেননা, শক্ত হাতে বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলা করার সৎ সাহস বা ইচ্ছা সরকারের নেই। ভারতের ক্ষেত্রেও সেই একই পরিস্থিতি। কিন্তু প্রশ্ন করার কেউ নেই। কেউ করলে বরং তার জীবন নিয়েই সংশয়ও দেখা দিচ্ছে। রাষ্ট্রের দুর্নীতি দমনের বিভিন্ন ব্যবস্থা তাই গালভরাই শোনায়। এ দেশে আইনি জটিলতা এমন আকার ধারণ করেছে যে, অভিযোগ প্রমাণ হওয়ার আগেই অভিযুক্ত বৃদ্ধ হয়ে যায় বা মারা যায়। ‘India Against Corruption’ জনপ্রিয় হলেও আজ কে না জানে তা ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত স্বার্থ ছাড়া কিছু নয়।

উল্লেখ্য, প্রশাসনিক দুর্নীতি দমনের অন্যতম পদক্ষেপ লোকপাল বিল বিভিন্ন সময় লোকসভায় উত্থাপন হলেও পাশ হয়নি। ২০১১ সালে জন লোকপাল বিল নামে বিলটি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ পেরোলেও আইনে পরিণত হয়নি। আর আরও ভয়ঙ্কর ব্যাপার হল, ইদানীং দুর্নীতিকে সহজ-স্বাভাবিক করে তোলার একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছে। দুর্ভাবনা এই জন্য যে, নতুন প্রজন্মকে এই দুর্নীতিই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে প্রভাবিত করে আরও অন্ধকারে ঠেলে দেবে না তো?

ধর্মরূপী বক যুধিষ্ঠিরের কাছে জানতে চেয়েছিল— ‘কী ত্যাগ করলে মানুষ ধনী হয়? কী ত্যাগ করলে সুখী হয়?’ যুধিষ্ঠির তাতে বলেছিলেন— ‘কামনা ত্যাগ করলে লোকে ধনী হয়, লোভ ত্যাগ করলে সুখী হয়।’

সমস্যা হল, ‘যুধিষ্ঠির’-দের পাথরের মূর্তি করে আমরা ‘দেখা’র বস্তু করে তুলছি, মনের নয়। আর এর ফলও প্রতিদিন আমাদের পোহাতে হচ্ছে। নিজেদের তৈরি করা জালে নিজেরাই জড়িয়ে পড়ছি। যে সব রাষ্ট্র দুর্নীতির প্রশ্নে কঠোর, সেখানে দুর্নীতি কম। তবু রাষ্ট্রের দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপই এই সমস্যার সুরাহা নয়। একই সঙ্গে সামাজিক পরিবেশ, মূল্যবোধকেও গুরুত্ব দিতে হবে।

চাপড়া গভর্নমেন্ট কলেজের শিক্ষক

(মতামত লেখকের ব্যক্তিগত)

আপনার অভিমত

‘সবকা বিশ্বাস’ অর্জনে ঘৃণার হাত ছেড়ে বেরোতে হবে

এক টানা ১৮ ঘণ্টা ধরে অত্যাচারের পর যুবকটি এখন আর বেঁচে নেই। মৃত ব্যক্তির নাম তবরেজ আনসারি। এমন তবরেজদের তালিকা ক্রমশ দীর্ঘ হচ্ছে। লিখছেন

পঙ্কজ বিশ্বাস

“রহিমন দেখি বড়েনকো লঘু ন দিজিয়ে ডারি।/ জহাঁ কাম আবৈ সুই, কহা করৈ তরবারি।।” অর্থাৎ— বৃহৎকে দেখে কোরো না রহিম ক্ষুদ্রকে অবহেলা।/ তরবারি সেথা কোন কাজে লাগে যেখানে সূচের খেলা— লিখেছিলেন এক কবি। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হতে দেখে ফের লাইনগুলো মনে পড়ে গেল। দেখলাম, ল্যাম্পপোস্টে বাঁধা এক যুবককে কয়েক জন গালিগালাজ ও শারীরিক নির্যাতন করে বাধ্য করছে ‘জয় শ্রীরাম’, ‘জয় হনুমান’ বলতে। আর যুবকটিও অসহায় যন্ত্রণা নিয়ে তা বলছেন। এক টানা ১৮ ঘণ্টা ধরে এই অত্যাচারের পর যুবকটি এখন আর বেঁচে নেই।

নিহত ব্যক্তির নাম তবরেজ আনসারি। ঘটনাস্থল বিজেপি শাসিত রাজ্য ঝাড়খণ্ড। সরাইকেলা খরসোঁয়া জেলার ধক্তিদি গ্রাম।

পরিসংখ্যান বলে, ২০১৬ সালের পর এই নিয়ে মোট ১৩ জনকে পিটিয়ে মারা হল ঝাড়খণ্ডে। শুধু ঝাড়খণ্ডই বা কেন, বিগত কয়েক বছর ধরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই ধরনের অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটে চলেছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই অসহিষ্ণুতার শিকার মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ। অভিযোগের আঙুল হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোর দিকে। গোরক্ষার নামে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের জীবন ও জীবিকার উপর আঘাত হানা, এমনকি পিটিয়ে মারা পর্যন্ত হচ্ছে। ‘লাভ জিহাদ’-এর মতো হাস্যকর এবং বিদ্বেষপূর্ণ অজুহাতে সুখী দাম্পত্যকে তছনছ করে দেওয়া হচ্ছে। ইদের বাজার করে ফেরা মুসলিম কিশোরকে বন্ধুদের সামনেই ছুরি মেরে ট্রেন থেকে ফেলে দেওয়ার মতো মর্মান্তিক ঘটনাও আমাদের স্মৃতি থেকে মুছে যায়নি।

আর এই ঘটনার বাইরেও আরও অনেক ঘটনা নিশ্চয় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে চলেছে, যা হয়তো আমাদের কানে এসে পৌঁছয় না। বলা যায়, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ প্রাত্যহিক জীবনে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। তাদের কাছে ‘এ বড় সুখের সময় নয়’। ঔপনিবেশিক শাসনের থেকে মুক্তি পাওয়ার ৭০ বছর পরে আজও ধর্মকে কেন্দ্র করে এই বর্বর ঘটনার সাক্ষী থাকতে হচ্ছে আমাদের। যা সত্যিই ভারতবাসী হিসাবে আমাদের সকলের লজ্জা।

মানুষের সঙ্গে মানুষের এই ঘৃণার পরিবেশ একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল তাদের নিজেদের স্বার্থে সৃষ্টি করছে, এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। সঙ্ঘ মডেলের ভারতচেতনা এর জন্য দায়ী। “বাইরের শত্রু হল পশ্চিম দুনিয়া, আর অন্দরের শত্রু হল ভারতীয় মুসলিম, খ্রিস্টান এবং কমিউনিস্টরা।”— আরএসএস-এর চিন্তানায়ক সদাশিব ‘গুরুজি’ গোলওয়ালকার তাঁর ‘বাঞ্চ অব থটস’-এ এই ভাবনা জানিয়েছেন।

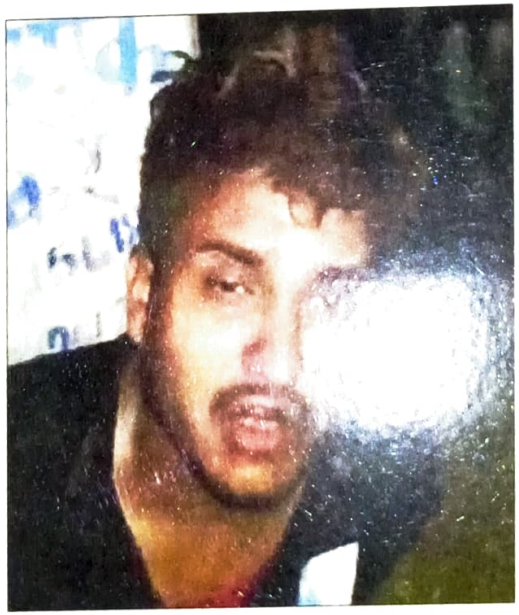

এই ভাবনাকে মেনে নিলে ভারতে ইসলামের শাসনের অবদানকেই অস্বীকার করতে হয়। মুসলিম শাসক মানেই যেন হিন্দুদের উপর অত্যাচারী! এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে মুসলিমদের শত্রু হিসাবে ভাবতে শেখায় ও প্রতিশোধ নিতে শেখায়। হচ্ছেও তাই। ঐতিহাসিক স্থানের নাম বদলে যাচ্ছে। কোথাও মাথায় টুপি পরতে মানা করা হচ্ছে। ভারতমাতার জয়গান না করলেই শোনানো হচ্ছে পাকিস্তানে চলে যাওয়ার কথা। এক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ভোটের লড়াইকে বর্ণনা করেছেন ‘আলি এবং বজরংবলী’ লড়াইয়ের শব্দবন্ধে। দেশের উত্তর-পূর্বে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী রাজ্যে নাগরিকপঞ্জির নামে মুসলিম সম্প্রদায়কে বিতারণের জিগির তুলে দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করা হচ্ছে। পাবলিক স্ফিয়ার বা জনমানস সেই প্রভাবে প্রভাবিত হওয়ায় সামাজিক সম্পর্ককে ব্যাহত করছে। এর বিষ কতটা মারাত্মক হতে পারে, একটি ছোট্ট ঘটনার উল্লেখ করলে বোঝা যাবে।

লোকসভা ভোটের ফলাফল বেরনোর দু’দিন পরের ঘটনা। ক্লাস সিক্সের একটি ছাত্র আর স্কুলে যেতে চাইছে না। দু’তিন দিন কেটে গেলে ছাত্রটির মায়ের সন্দেহ হয়। ছেলেকে জিজ্ঞাসা করায় যে উত্তর পায়, তা খুব ভয়ঙ্কর। ছেলেটির পাশে নাকি তার সহপাঠীরা বসতে চায় না। একটি ছেলের জলের বোতল থেকে জল খেতে গেলে সে কেড়ে নেয়। “আম্মা, আমার বন্ধুরা বলেছে আমাদের না কি বাংলাদেশে তাড়িয়ে দেওয়া হবে? সত্যিই আমরা বাংলাদেশে চলে যাব?”— ঘটনাস্থল আমাদের পশ্চিমবঙ্গ।

ভারত বলতে তো আমরা বহুকাল ধরে বুঝে এসেছি বহুত্ব, বৈচিত্র্য এবং সমন্বয়ের যোগ। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা বলার লোভ সামলাতে পারছি না। গল্পটি আছে সঈদ নাকভির ‘বিয়িং দি আদার’ গ্রন্থে।

সঈদ তাঁর বাল্যকালের স্মৃতিচারণা প্রসঙ্গে জানাচ্ছেন লোকগান সোহরের কথা। সন্তানের মঙ্গলকামনার লোকগান এই সোহর। তাঁর আম্মার প্রিয় একটি সোহরের মূল আখর— ‘আল্লা মিয়াঁ হামরে ভাইয়াকো দিয়ো নন্দলাল’। অর্থাৎ, মুসলিম হয়েও কৃষ্ণকে সন্তান হিসাবে পেতে তাঁরা অভিলাষী। এই উদার ভারতের ধারণাই আজ বিপর্যয়ের

অনুসারে ৫৪৩টি লোকসভা আসনের মধ্যে এমন ২৯টি আসন রয়েছে, যেখানে মুসলিম জনসংখ্যা ৪০ শতাংশের চেয়ে বেশি। সংখ্যালঘু মানুষের জীবন-জীবিকা, সংস্কৃতির উপরে এই ধরনের আঘাত যে বিদ্বেষের বাতাবরণ তৈরি করে— সেই আঘাত উল্টো দিক থেকে এলে তখন কী হবে? ভাবলেই ভয় হয়!

দেশের শাসক যদি ‘বিকাশ’কেই পাখির চোখ করে, তবে সেই পথ হবে ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনজনিত চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিসাধন।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে সম্রাট বাবরের পুত্র হুমায়ুনকে উদ্দেশ করে লেখা চিঠির কথা— “এটা সম্পূর্ণ সত্যি যে তুমি সমস্ত ধর্মান্ধতামুক্ত হৃদয় নিয়ে সমস্ত সম্প্রদায়ের রীতি অনুসারে ন্যায়প্রদান করবে। এবং বিশেষ করে গরুর বলিদান থেকে বিরত থাকবে, কারণ এই পথেই হিন্দুস্তানের জনগণের হৃদয় জিতে নেবে; এবং রাষ্ট্রের জনগণ রাজানুগত্যের মধ্যে দিয়ে তোমার প্রতি নিয়োজিত থাকবে। এবং কোনও মন্দির ও অন্য ধর্মীয় ক্ষেত্রগুলিকে তুমি ধ্বংস করবে না। এমন ভাবে ন্যায় প্রদান করো যাতে এই রাষ্ট্র তার সমস্ত প্রজাদের নিয়ে সুখী হয় এবং একই ভাবে সমস্ত প্রজারা খুশি হয় তাদের রাষ্ট্রকে নিয়ে। ইসলামের প্রগতি দয়ার তলোয়ারের দ্বারা হয়, অত্যাচারের তলায়ারের দ্বারা নয়।”

‘সবকা বিশ্বাস’ অর্জনের জন্য এটাই উপযুক্ত পথ। সে কথা যত দ্রুত শাসক বুঝবে, এই দেশের নাগরিকের জন্য মঙ্গল।

(সঙ্গের ছবি: ভিডিয়ো থেকে নেওয়া, নিগৃহীত তবরেজ আনসারি)

চাপড়া গভর্নমেন্ট কলেজের শিক্ষক

ইমেল-এ সম্পাদকীয় পৃষ্ঠার জন্য প্রবন্ধ পাঠানোর ঠিকানা:
edit.nadia@abp.in
যে কোনও ইউনিকোড ফন্ট-এ টাইপ করে পাঠাবেন। অনুগ্রহ করে সঙ্গে ফোন নম্বর জানাবেন।

কৃষিঋণ মকুবের মধ্যে দিয়েই যে কৃষকদের সঙ্কটমোচন হবে, বিশেষজ্ঞেরা তা মনে করেন না। ২৩ ডিসেম্বর কৃষিদিবস পেরিয়ে এসে লিখছেন

পঙ্কজ বিশ্বাস

আপনার অভিমত

কৃষকেরা রাজনৈতিক দলের ভোটের ‘তাস’ হয়ে উঠেছে

“উহাদের এই ভাদ্রের রৌদ্রে মাথা ফাটিয়া যাইতেছে, তৃষায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, তাহার নিবারণজন্য অঞ্জলি করিয়া মাঠের কর্দ্দম পান করিতেছে; ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে, কিন্তু এখন বাড়ী গিয়া আহার করা হইবে না, এই চাষের সময়। সন্ধ্যাবেলা গিয়া উহারা ভাঙ্গা পাতরে রাঙ্গা রাঙ্গা বড় বড় ভাত, নুন, লঙ্কা, দিয়া আধপেটা খাইবে। তাহার পর ছেঁড়া মাদুরে, না হয় ভূমে, গোহালের এক পাশে শয়ন করিবে—উহাদের মশা লাগে না। তাহার পরদিন প্রাতে আবার সেই এক হাঁটু কাদায় কাজ করিতে যাইবে ...।”

বঙ্কিম সেই উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালি কৃষকদের দুরবস্থা দেখে ‘বঙ্গদেশের কৃষক’ প্রবন্ধে এমনটা লিখেছিলেন। তার পর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে। এই সময়ে দাঁড়িয়েও কি কৃষকদের অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয়েছে বলে আমরা জোর গলায় দাবি করতে পারি? দৈনিক সংবাদপত্রের পাতা ওলটালেই কোথাও ঋণের দায়ে কৃষকের আত্মহত্যা, ফসল নষ্ট হওয়ার কারণে কৃষকের বিমর্ষ মুখের ছবি, কিংবা ফড়েদের খপ্পরে তাদের অসহায়তার খবর চোখে পড়ে। আলু বা পেঁয়াজের দাম একটু বেড়ে গেলে আমাদের গলা ওঠে। মিডিয়াও সেটাকে খবর করে। কিন্তু এই প্রশ্ন ওঠে না যে, এই দাম বৃদ্ধির সঙ্গে কৃষকের প্রাপ্য (যদিও দামবৃদ্ধির জন্য মিডলম্যানও দায়ি) জড়িয়ে রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আমাদের দেশে আজও প্রতিদিন ৪৭ জন কৃষক আত্মহত্যা করে, ১০০ জন কৃষক আত্মহত্যার চেষ্টা করে। কৃষির দুরবস্থা জেনেই আজকাল কৃষক তার সন্তানকে কৃষিকাজে নামাতে চায় না। প্রতিদিন ২১৫০ জন কৃষক কৃষিকাজ ছেড়ে অন্য পেশা গ্রহণ করছে। সুরেশ তেন্ডুলকর কমিটির তথ্য অনুযায়ী, ভারতের ৪২ শতকরা কৃষক আজও বিপিএল তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

অথচ, এই কথা তো আমরা জানি ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। এই দেশের অর্ধেকের বেশি মানুষের রুটি-রুজি কৃষিব্যবস্থার ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। অর্থাৎ, এই বিপুল জনগোষ্ঠী ও উৎপাদন গোষ্ঠীকে সরিয়ে রেখে দেশের সার্বিক বিকাশ কখনওই সম্ভব নয়। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যারা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহন করেছিল সেই কৃষক সম্প্রদায়ই স্বাধীনতার এত বছর পর আজও অবহেলিত। বরং আজ তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভোটের ‘তাস’ হয়ে উঠেছে।

মনে পড়বে, ২০১৪ সালে কেন্দ্রে বিজেপি ক্ষমতায় আসে বিশেষ করে এই কৃষকদের সমর্থন দ্বারা। কিন্তু যে স্বপ্ন দেখিয়ে তারা এই কৃষকদের ভোট নিয়ে ক্ষমতায় এসেছে, যেমন—কৃষকদের কৃষিঋণ মুকুব, উৎপাদন বাড়ানো, দালাল মুক্ত বাজার তৈরি, সেই স্বপ্ন কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে, প্রশ্ন জাগে। উপরন্তু নেমে এসেছে ডিমনিটাইজেশন নামক খাঁড়ার ঘা। আর এর পরিণতি হয়েছে ভয়ানক। একটি তথ্য অনুযায়ী, ১৯৯৮ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত ৩ লক্ষ কৃষক আত্মহত্যা করেছে। উল্লেখ্য, কেন্দ্র ২০১৫ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত কৃষক আত্মহত্যার কোনও পরিসংখ্যানই প্রকাশ করেনি।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়বে এই বছরের ... কিংবা তার কয়েক মাস পরে, নভেম্বরে দিল্লিতে হিন্দি বলয়ের কৃষকদের লং মার্চের কথা। মূলত, কৃষিঋণ মকুবের দাবি নিয়েই তারা পথে নামে। কৃষিঋণ মকুবের এই দাবি এবং এই আন্দোলন কিন্তু তাদের ঘা-কেই চিনিয়ে দেয়। জানা যায়, দেশের বিভিন্ন প্রান্তের কৃষকেরা আড়াই লক্ষ কোটি টাকার বেশি কৃষি ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল নষ্ট হওয়া, ফসলের ন্যায্যমূল্য না পাওয়া, কোথাও বা ‘মিডলম্যান’এর খপ্পরে পড়ে দাম না পাওয়ার প্রসঙ্গ বার বার উঠে এসেছে এই ঋণ পরিশোধ করতে না পারার কারণ হিসাবে।

আর বিরোধীদল হিসাবে কংগ্রেস কৃষকদের সেই ক্ষোভকেই নির্বাচনী কৌশলের প্রধান ইস্যু হিসাবে প্রয়োগ করেছে। ফলও মিলেছে হাতেনাতে। সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে তাদের দল জয়ী হয়েছে। তাই শপথ নেওয়ার পর পরই তিন হিন্দি বলয় রাজ্যে নব নির্বাচিত রাজ্য সরকার কৃষিঋণ মকুবের কথা ঘোষণা করেছে। মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তীশগঢ় মিলিয়ে মোট ৭২ হাজার কোটি টাকার এই খয়রাতি। অবশ্য শুরুটা হয়েছিল উত্তরপ্রদেশ দিয়ে। যাই হোক কংগ্রেসের এই ঋণ মকুবের তাস কি এর পর বিজেপিও সারা দেশে খেলবে না? ইতিমধ্যে গুজরাত ৬৫০ কোটি টাকা গ্রামীণ বিদ্যুৎ বিল মকুব করে বসেছে। অসমের বিজেপি সরকারও সেই পথে হাঁটছে।

কিন্তু কৃষিঋণ মকুবের মধ্যে দিয়েই যে কৃষকদের সঙ্কটমোচন হবে, বিশেষজ্ঞেরা তা মনে করেন না। এতে তাদের সাময়িক সুরাহা হতে পারে শুধু। অনেক ক্ষেত্রে নতুন করে ধার নিয়ে ফের এক বার ভোটের মুখে তা মকুব হবে বলে আশা করতে শুরু করেন কৃষকেরা। নাভিশ্বাস ওঠে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির। তাই কৃষিঋণ মকুবকে কিছুতেই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির অঙ্গ করা উচিত নয় বলে মনে করেছেন তাঁরা। (চলবে)

(*উদ্ধৃতির বানান অপরিবর্তিত*)

চাপড়া গভর্নমেন্ট কলেজের শিক্ষক

আপনার অভিমত

কৃষকের প্রাপ্য লুটে নিচ্ছে ফড়েরাই

১৯৯০ সালে জাতীয় আয়ে কৃষিক্ষেত্রে অবদান ছিল ২৯ শতাংশ। এই সময়ে তা ১৬ শতাংশে নেমে এসেছে। যা ভারতীয় কৃষির তথৈবচ দশাকে স্পষ্ট করে। লিখছেন

পঙ্কজ বিশ্বাস

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন গভর্নর রঘুরাম রাজনের মতে, এতে যে শুধু কৃষি ক্ষেত্রে লগ্নি ধাক্কা খায় তাই নয়। একই সঙ্গে সরকারকে খাবি খেতে হয় ঘাটতি নিয়ন্ত্রণ রাখতে। তাই ভোট অঙ্কের কথা ভেবে যখন রাহুল গাঁধী এই রকম ঘোষণা করে বসেন, ক্ষমতায় এলে তার সরকার গোটা দেশের কৃষকদের কৃষিঋণ মকুব করে দেবেন, তখন দুর্ভাবনা হয় বইকি! প্রসঙ্গত, বলে রাখা যাক, কৃষিঋণ মূলত অবস্থাপন্ন ও মাঝারি কৃষকেরাই গ্রহণ করে থাকে। তাই কৃষিঋণ মকুব হলে প্রান্তিক চাষিদের তেমন লাভ হয় না।

এ কথা অস্বীকার করার কোনও মানে নেই যে, কৃষকদের উন্নতির জন্য পদক্ষেপ নিতে গেলে তাকাতে হবে কৃষি সমস্যার গোড়ার দিকে। ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশে কৃষকদের সবচেয়ে বড় শত্রু হল প্রকৃতি। প্রকৃতি বিমুখ হলে কৃষকের দুঃখের অন্ত থাকে না। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ঝড় ইত্যাদি কারণে প্রতি বছরই কৃষক তার ফসল নিয়ে সমস্যায় পড়ে। এই সময়ে ভারতের কৃষকদের যে দুরবস্থা তার প্রধান কারণ হিসাবে দায়ি করা যায় ২০১৪ এবং ২০১৫ সালের খরাকে। মহারাষ্ট্র, গুজরাত, কর্ণাটকের কৃষকেরা মূলত এই খরা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। এতে কৃষক যেমন কৃষিতে নিয়োজিত মূলধন ঘরে তুলতে পারেননি, তেমনই শোধ করতে পারেনি বকেয়া ঋণের পরিমাণ। কৃষকের দুর্দিনে রাষ্ট্র বিভিন্ন ভাবে হাত বাড়ালেও, বাস্তবে দেখা যায় সেগুলির সুফল পেয়ে থাকেন অবস্থাপন্ন চাষিরাই।

২০১৬ সালে 'প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা' চালু হয়। চাষ ভাল না হলেও কৃষকের যাতে অসুবিধা না হয়, সেই কথা ভেবে এই প্রকল্পের পরিকল্পনা। কিন্তু বাস্তবে এর সুফল কৃষকেরা এখনও ভোগ করতে পারেননি। কেননা, এই প্রকল্পের আওতায় খুব কম সংখ্যক কৃষককে আনা গিয়েছে। প্রকল্প রূপায়ণে সরকারি ঔদাসীন্য, উচ্চ হারে প্রিমিয়াম, সর্বোপরি কৃষকদের অসচেতনতা এর জন্য দায়ী। আর এই প্রকল্প সম্পর্কে দুর্নীতির অভিযোগও কম নয়। মহারাষ্ট্রের পরভণী জেলার উদাহরণ দিয়ে সাংবাদিক পি সাইনাথ ব্যাখ্যা করেছেন, এই জেলায় প্রায় ২ লক্ষ ৮০ হাজার সোয়াবিন চাষির থেকে একটি বেসরকারি বিমা সংস্থা ১৯ কোটি টাকার বেশি প্রিমিয়াম আদায় করেছে। কেন্দ্র ও রাজ্য ৭৭ কোটি টাকা করে দিয়েছে। অর্থাৎ, বিমা সংস্থা এক বছরে জেলা থেকে ১৭৩ কোটি টাকা ঘরে তুলেছে। আর ফসল নষ্ট হওয়ার পর তারা ক্ষতিপূরণ মিটিয়েছে মাত্র ৩০ কোটি টাকা। অর্থাৎ, একটি জেলা থেকেই তাদের লাভ ১৪৩ কোটি টাকা। আর তাই অনেক কৃষকই এই বিমার আওতা থেকে বেরিয়ে আসছে।

মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কৃষক যে ফসল উৎপন্ন করে, তার যথার্থ মূল্যও কি কৃষক পায়? আমার নিজের গ্রামে পেঁপে, লঙ্কার মতো ফসল এই বার মাঠেই 'মারা' যেতে দেখলাম। কেননা, ফসল মাঠ থেকে তুলতে যা খরচ, বাজারে বিক্রি করে সেই টাকাও কৃষকের ঘরে ফেরে না। এই প্রসঙ্গে মনে পড়বে স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশের কথা। এই কমিশন উৎপাদিত ফসলের সহায়ক মূল্য দেড় গুণ বৃদ্ধি করার কথা বলেছিল। প্রায় দু'দশক আগের এই সুপারিশ কেন্দ্রের কোনও সরকারই গুরুত্ব দিয়ে দেখেনি। যেটুকু সহায়ক মূল্য সরকার দেয়, তা অনেক সময় দরিদ্র কৃষকের কাছে এসে পৌঁছায় না। সম্পন্ন কৃষকেরাই এর সুফল ভোগ করে। প্রান্তিক কৃষকদের অজ্ঞতা, তৎপরতার অভাগ, পঞ্চায়েতের রাজনীতি এর জন্য দায়ী।

সম্প্রতি দৈনিক সংবাদপত্রের পাতায় বার বার অভিযোগ এসেছে কিসান মান্ডিগুলিতে ধান বেচাকে উপলক্ষ করে দুর্নীতির কথা। যা ফড়ে বা বড় বড় ব্যবসায়ীদের 'হাত'। যার ফলে কৃষক তাঁর প্রাপ্যমূল্য পান না। নবান্নের খবর, কেন্দ্রীয় সরকার ধানের সহায়ক মূল্য কুইন্টাল প্রতি ২০০ টাকা বাড়িয়েছে। এর সঙ্গে রাজ্য কুড়ি টাকা বোনাস ঘোষণা করেছে। সব মিলিয়ে সরকারের কাছে সরাসরি ধান বিক্রি করলে কৃষকদের কুইন্টাল প্রতি ১৭৭০ টাকা পাওয়ার কথা। কিন্তু অভিযোগ উঠেছে, বিভিন্ন জেলায় ফড়েরা কৃষকদের কাছ থেকে প্রতি কুইন্টাল ১৪০০-১৪৫০ টাকায় ধান কিনে তা সরকারি কেন্দ্রে বিক্রি করে যাচ্ছে। অর্থাৎ, কৃষকের যা প্রাপ্য ছিল তা অধিকা[illegible]। শুধু ধান নয়, অন[illegible]তে গিয়ে ফড়েদের এই বাড়বাড়ন্তে কৃষক তাঁর ঠিক মূল্য পায় না। সরকার এ সব ক্ষেত্রে কৃষকের হয়ে সদর্থক ভূমিকা নিতে পারে। নিচ্ছেও। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় স্থানীয় নেতা বা 'দাদা'রা এই সব কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। তাই সমস্যার নিরসন খুব মসৃণ হয় না।

কেন্দ্র প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, আগামী চার-পাঁচ বছরে কৃষি রফতানি দ্বিগুণ করে কৃষকের আয় দ্বিগুণ করবে। 'ইকোনমিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া, ২০১৬' অনুযায়ী ভারতের সতেরোটা রাজ্যের পরিবার পিছু বার্ষিক আয় কুড়ি হাজার টাকা। অর্থাৎ পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি কৃষক পরিবারের মাসিক আয় সতেরশো টাকারও কম। তাই রোজগার দ্বিগুণ হলেও কি সমস্যার সমাধান হবে? আর তার চেয়ে ভাবনার কথা কৃষি বিপণনে উপযুক্ত পরিকাঠামো কি দেশে তৈরি হয়েছে? নীতি আয়োগের তথ্য অনুযায়ী তা হয়নি। 'অরগ্যানাইজেশন ফর ইকোনমিক অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট' (ওইসিডি)-এর মতে, আইনি জটিলতা এবং পরিকাঠামোর অভাবই প্রবল ভাবে প্রভাব ফেলে কৃষি বিপণনে। পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকালে দেখা যায়, আনাজ উৎপাদনে দেশের মধ্যে এই রাজ্য প্রথম হলেও রফতানিতে শেষের দিকে। আনাজ রফতানির তেমন কোনও টার্গেট বা অ্যাকশন প্ল্যানই এই রাজ্যে এখনও তৈরি হয়নি। সুতরাং আনাজ মাঠেই পচে, নয়তো গবাদি পশুর খাদ্য হয়।

স্বাতী ভট্টাচার্যের 'নষ্ট নয়, রফতানি হোক' লেখা থেকে জানা গেল, এই রাজ্য থেকে দৈনিক দশ টন আনাজ, ফল বিভিন্ন দেশে রফতানি হয়। পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের সব রাজ্যের ফল-আনাজ রফতানির জন্য ভরসা দত্তপুকুরের একটি প্যাকিং হাউস। যেটি বেসরকারি। অর্থাৎ আনাজের জন্য তেমন স্টোর হাউজ নেই। তাই আনাজের জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করা গেলে নিশ্চয়ই এই রফতানি বাড়িয়ে কৃষককে অভাবি বিক্রি থেকে রক্ষা করা যেতে পারে।

সমস্যার এখানেই শেষ নয়। এই সে দিন পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামে সেচের জল পায়নি বলে ধানের খেতে আগুন লাগিয়ে প্রতিবাদ জানাল কৃষকেরা। ভারতে চাষযোগ্য জমির ৬৪% সেচ-সেবিত। কিন্তু বিভিন্ন কারণে সেই ব্যবস্থাও বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। গৃহীত প্রকল্পগুলিও বিভিন্ন কারণে এখনও বাস্তবায়িত হতে বড্ড ঢিলে হয়ে যায়। কৃষির উৎপাদনশীলতার হ্রাস, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের যথেষ্ট ও উপযুক্ত প্রযুক্তি না থাকা, ছোট চাষিদের প্রযুক্তির সহায়তা গ্রহণ করতে না পারা, নগরায়ন ইত্যাদি কারণে কৃষক বিভিন্ন ভাবে মার খাচ্ছে। সরকারি প্রকল্পগুলি সম্পর্কেও কৃষকেরা খুব সচেতন নন। সচেতনতা মূলক পাঠ তাঁদের দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

২০১৮-এর জুন মাসের ১ তারিখ থেকে ১০টি রাজ্যের কৃষকেরা ১০ দিনের ধর্মঘট করে তাদের ফসল বাজারে না পাঠিয়ে নষ্ট করে। কৃষকদের ক্ষোভ ছিল বিদেশ থেকে কম দামে আমদানি করা আনাজ এবং দুগ্ধজাত পণ্যের বিরুদ্ধে। কেননা, এগুলো তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী। কৃষির আরও একটি সমস্যা শ্রমের অভাব। বর্তমানে বিভিন্ন কারণে বিশেষ করে MNREGA চালু হওয়ার পর কৃষিতে শ্রমিকের অভাব ঘটেছে। অনেকেই একে 'কৃষি বিরোধী প্রকল্প' বলেন। সব চেয়ে ভাল হয় কৃষিকে এই প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসা। যাতে করে শ্রমিকেরা কৃষিতে কাজ করতে পারেন। তাতে কৃষিকাজে শ্রমিক সমস্যাও মিটতে পারে।

উল্লেখ্য, ১৯৯০ সালে জাতীয় আয়ে কৃষিক্ষেত্রে অবদান ছিল ২৯ শতাংশ। এই সময়ে ১৬ শতাংশে তা নেমে এসেছে। এই তথ্য ভারতীয় কৃষির তথৈবচ দশাকে স্পষ্ট করে দেয়। কৃষকের সমস্যা রাতারাতি নিরসন করার নয়। মুক্ত বাজার অর্থনীতির সঙ্গে তাল রেখে সুস্থ পরিকল্পনা নিয়ে রাষ্ট্রকেই এগিয়ে আসতে হবে। না হলে 'ঋণ মকুব'কে কুম্ভীরাশ্রুই মনে হবে। (শেষ)

চাপড়া গভর্নমেন্ট কলেজের শিক্ষক